بسم الله الرحمن الرحيم

যুদ্ধের পাঠ্যসূচী ও গোরিলা যুদ্ধ

[যুদ্ধ শিল্পের আলোকে]

মূলঃ হিক্‌মাতুল্লাহ লোদী

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	যুদ্ধের ধারণা	৯
	যুদ্ধের সংজ্ঞা	১০
	যুদ্ধের পরিভাষাঃ	১১
	যুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষঃ	১১
	যুদ্ধে বন্ধু ও শত্রুদের পরিক্ষা করার মাপকাঠী মানদন্ডঃ	১২
	দ্বন্দ্ব বা মতানৈক্য বা মতবিরোধ	১৪
	দ্বন্দ্বের / মতানৈক্যর প্রকারভেদ	১৪
	কারণগত অর্থাৎ দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ অনুযায়ী যুদ্ধের প্রকারভেদ	১৫
	আদর্শিক দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ	১৬
	চিন্তাধারার প্রার্থক্য	১৮
	ব্যক্তিগত অভিরুচি	১৯
	প্রত্যক্ষ বা আমলী দ্বন্দ্ব	২০
	সামাজিক কর্মতৎপরতার প্রার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বন্দ্ব	২১
	অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব	২২
	ভৌগলিক দ্বন্দ্ব	২৪
	শক্তি অর্জনের ব্যাপারে দ্বন্দ্ব	২৫
	আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দ্বন্দ্ব	২৬
	প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা	২৬
	দ্বন্দ্বের দলীয় প্রকারভেদ	২৭
	ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব	২৮
	গোত্রীয় দ্বন্দ্ব	২৮
	জাতীয় বা ধর্মীয় দ্বন্দ্ব	২৯
	রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দ্বন্দ্ব	৩০
	সমস্যার সমাধান	৩১
	প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা	৩২

	যুদ্ধের সরঞ্জাম	৩৫
	ত্রাস বা আতঙ্ক সৃষ্টিকারী যুদ্ধ	৩৮
	নিরাপত্তা বহনকারী যুদ্ধ	৩৮
	সমযোগ্যতা সম্পূর্ণ বিশিষ্ট যুদ্ধ	৩৮
	আক্বদাম বা পদক্ষেপ।	৩৯
	দিফা'আ বা আত্মরক্ষা	৩৯
	যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং মাকসাদে জং বা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	৪১
	যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং যুদ্ধের প্রদ্ধতির [ত্রাস, নিরাপত্তা এবং সমযোগ্যতার দিক দিয়ে]।	৪২
	যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং ত্রাস বা আতঙ্ক সৃষ্টিকারী যুদ্ধ	৪৩
	যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং অগ্রনিরাপত্তাবাহী যুদ্ধ	৪৪
	যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং সমবাদী যুদ্ধ	৪৫
	যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং যুদ্ধের ময়দান	৪৫
	যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং দাওয়াতী ময়দান	৪৬
	যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং রাজনৈতিক ময়দান	৪৮
	যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং অর্থনৈতিক ময়দান	৪৯
	যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং আসকারী ময়দান	৫০
	যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং যুদ্ধের কর্মতৎপরতাসমূহ	৫২
	তানযিমে হরব বা সংগঠিত যুদ্ধ পরিচিতি	৫৩
	যুদ্ধ বিন্যাস	৫৩
	আসকারী বা সশস্ত্র শক্তির পরিচয়	৫৫
	আসকারী শক্তির মৌলিক দক্ষতা	৫৬
	আক্রমণ বা আঘাত করার যোগ্যতা	৫৬
	অবস্থান পরিবর্তন করার যোগ্যতা	৫৮
	আত্মরক্ষার যোগ্যতা	৬০
	আসকারী শক্তির পরিমাপ বা ওজন	৬১
	সশস্ত্র শক্তির ওজন, পরিমাপ এবং ঘনত্বের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক	৬২
	সশস্ত্র শক্তির প্রকাভেদ	৬৪
	কাবাইলী বা গোত্রীয় সেনাবাহিনী	৬৪
	শাহী সেনাবাহিনী বা রাজকীয় সেনাবাহিনী	৬৫

	উম্মাহর সেনাবাহিনী	৬৬
	জাতীয় সেনাবাহিনী	৬৮
	আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী	৬৯
	গোরিলা সৈন্য দল	৭১
	গোরিলা যুদ্ধ	৭৩
	আধুনিক যুগে গোরিলা যুদ্ধের ইতিহাস	৭৪
	গোরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি	৭৯
	গোরিলা যুদ্ধের মূলনীতি	৮০
	গোরিলা যুদ্ধের স্তরসমূহ	৮১
	(কৌশলগত) পশ্চাদপসরণ করার পর্যায়	৮২
	সংগঠনকে নতুন করে গড়ে তুলার স্তর	৮২
	শক্তি অর্জনে শত্রুদের সমমানে আসার স্তর	৮৪
	শাসন ব্যবস্থাকে অকেজো করে ফেলার স্তর	৮৬
	রাজনৈতিক সংলাপের স্তর বা পর্যায়	৮৬
	অস্থায়ী অবস্থার স্তর	৮৬
	বিজয়ের স্তর	৮৭
	গোরিলা যুদ্ধের মৌলিক ইতিবৃত্ত	৮৮
	চিন্তাধারা	৮৮
	নেতাবৃন্দ	৮৯
	জনগণের সমর্থন	৮৯
	ভৌগলিক স্থান (নিরাপদ আশ্রয়স্থল)	৯০
	রাজনৈতিক সমর্থন	৯০
	গোরিলা যুদ্ধ এবং সমাজ	৯২
	গোরিলা যুদ্ধ এবং সমাজের বিভিন্ন দিক	৯২
	দেশ ও সমাজের ইতিহাস	৯৩
	সমাজের সকল স্তরের লোকজন এবং দলসমূহ	৯৪
	সমাজে পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গদের স্তর	৯৫
	সমাজের প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী লোকদের স্তর	৯৬
	সমাজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানকারী লোকদের স্তর।	৯৬
	সমাজের বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাশীল লোকদের স্তর	৯৭
	আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশা রেখে	৯৭

	আমলকারীদের দল	
	আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশা না রেখে আমলকারী লোকদের দল	৯৮
	মানব সমাজে উপস্থিত দলসমূহের সারসংক্ষেপ	৯৯
	দেশের শাসন ব্যবস্থা	১০০
	শাসন ব্যবস্থার মৌলিক অংশ	১০০
	শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা পদ্ধতি	১০১
	এ শাসন ব্যবস্থার সহায়ক এবং হিফাযতকারী প্রতিষ্ঠান	১০২
	শাসন ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানঃ	১০২
	শাসন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান	১০৩
	শাসন ব্যবস্থাকে শক্তি এবং সরঞ্জাম প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	১০৩
	গোরিলাদের যোগ্যতা	১০৪
	গোরিলা এবং সমাজের সাথে তাদের সম্পর্ক	১০৪
	সমাজে গোরিলাদের বন্ধু ও শত্রু	১০৬
	গোরিলা যুদ্ধ এবং দাওয়াতী শাখা	১০৭
	দাওয়াতের ধরন হিসাবে দাওয়াতের প্রকারভেদ	১০৭
	সাধারণ দাওয়াত	১০৮
	অসাধারণ বা বিশেষ দাওয়াত	১০৮
	পদক্ষেপ নেয়ার দিক দিয়ে দাওয়াতের প্রকারভেদ	১০৯
	আক্রদামী দাওয়াত	১০৯
	দিফায়ী দাওয়াত	১১০
	সমাজের স্তরের দিক দিয়ে দাওয়াতের প্রকারভেদ	১১০
	সমর্থক	১১১
	অচেতন সমর্থক	১১১
	পথভ্রষ্ট বিরোধী	১১২
	বিরোধী	১১৫
	গোরিলা যুদ্ধের ময়দান	১১৬

	গোরিলাদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল	১১৮
	মুজাহিদীন এবং নিরাপদ আশ্রয় স্থলের সংরক্ষণ	১১৯
	নিরাপদ আশ্রয় স্থলের সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা	১২০
	দাওয়াতী কাজের জন্য বিভিন্ন স্থর	১২০
	সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবগ	১২১
	শিক্ষাঙ্গনের ছাত্র এবং যুব সমাজ	১২১
	সমাজের সাধারণ লোক	১২১
	নিরাপদ আশ্রয় স্থলের রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা	১২২
	গোরিলা বিরোধ সরকারী কর্মসূচী নিম্নরূপ	১২৩
	উন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে স্থানীয় লোকদের সমর্থন অর্জন	১২৩
	গোরিলাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকদের সম্বনয়ে শান্তি বাহিনী বা গোত্রীয় সেনাবাহিনী গঠন	১২৪
	গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিষ্ঠা	১২৫
	শাসকদের রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্ট	১২৬
	গোরিলাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান	১২৬
	নিরাপদ আশ্রয় স্থলের সশস্ত্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা	১২৭
	সরকারী সামরিক অভিযান চলাকালে গারিলাদের সশস্ত্র প্রস্তুতি	১২৮
	নিরাপদ আশ্রয় স্থলের ভিতরে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে সামরিক অভিযান	১২৮
	নিরাপদ আশ্রয় স্থলে বাহির থেকে সেনাবাহিনীর আক্রমণ	১২৯
	গোরিলাদের যুদ্ধাভিযান ঘাঁটি	১২৯
	গোরিলা যুদ্ধাভিযানের এলাকা	১৩১
	গোরিলা যুদ্ধ এবং কার্যকর তৎপরতা	১৩৪
	গোরিলাদের অভিযান তৎপরতাসমূহ	১৩৪
	দাওয়াতী, প্রচার মাধ্যম এবং রাজনৈতিক তৎপরতার প্রকারভেদ	১৩৫
	সশস্ত্র অভিযান	১৩৫

	ব্যক্তিগত গোরিলা অভিযান	১৩৫
	গোরিলা সমষ্টিগত অভিযান	১৩৬
	অভিযান পরিকল্পণা	১৩৭
	পরিকল্পণার নিয়মনীতি	১৩৭

যুদ্ধের ধারণা

যখনই যুদ্ধের কথা বলা হয় তখনই চিন্তায়/মাথায় তীর, তলোয়ার, বন্দুক অথবা তোপের কথা মাথায় আসে। কিন্তু যুদ্ধের সংজ্ঞা ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। যুদ্ধ হচ্ছে একটা সাধারণ শব্দ। এর বিভিন্ন দিক রয়েছে। যুদ্ধ হচ্ছে দুই দলের মধ্যে অস্ত্র এবং অস্ত্রবিহীন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া। যুদ্ধের একটি দিক হচ্ছে আধ্যাত্মিক যার জন্য মানুষ সবকিছু বিসর্জন দিতে তৈরি হয়ে যায়। মানুষের ধ্যান-ধারণা বা চিন্তাধারা কিংবাবা আদর্শ যতো বেশি মজবুত/ শক্তিশালী হবে ততো বেশি সে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হবে।যুদ্ধের আরেকটি দিক হচ্ছে আর্থিক যার জন্য মানুষ সকল প্রতিকূল আবহাওয়া ও কষ্ট-কাঠিন্ন পাড়ি দিতে প্রস্তুত হয়।যুদ্ধের মধ্যে চারিত্রিক, আইনগত, দাওয়াত, রাজনৈতিক এবং আরো অনেক দিক আছে। যুদ্ধের ধারণ সকল গোত্র, জাতি, দেশ এবং মাজহাবের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী যুদ্ধের ধারণা ব্যক্ত করে থাকে। হিন্দু, ঈসায়ী, ইহুদী এবং নাস্তিকরা যুদ্ধের ক্ষেত্রে নিজস্ব আদর্শ বা চিন্তা-ধারা রাখে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে যুদ্ধের ধারণা ব্যতিক্রম। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ব্যতিত সকল যুদ্ধের ধারণাকে ইসলাম দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও বাতিল বলে আখ্যায়িত করে থাকে। ইসলাম একজন মুজাহিদকে যুদ্ধের সকল দিক সম্পর্কে ধারণা দান সহ পথ-প্রদর্শন করে থাকে। মুসলমান ও কাফিরদের যুদ্ধের মধ্যে বুনিয়াদি পার্থক্য আছে। কাফেরদের যুদ্ধ আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর দ্বারা নাজিল হয়নি বরং এটা মানবিক চিন্তা-ভাবনা, অভিজ্ঞতা, কুপ্রবৃত্তি এবং স্বার্থের জন্য হয়ে থাকে। ইসলামে যুদ্ধের ধারণা আল্লাহ প্রদত্ত। মুসলমান এই যুদ্ধকে এবাদত মনে করে প্রতিপালকের আনুগত্য ও তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার আলোকে করে থাকে।

❖ যুদ্ধের সংজ্ঞা

যুদ্ধের সমস্ত দিকগুলোকে পরিবেষ্টনকারী সংজ্ঞা সম্পর্কে যুদ্ধের দক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। মুজাহিদীনদের জন্য যুদ্ধের সংজ্ঞা সম্পর্কে একটা সমস্যা হচ্ছে

এই যে, প্রাশ্চাত্য ও ইসলামের মধ্যে এই সম্পর্কে অনেক পার্থক্য ও অনেক মতানৈক্য বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই পার্থক্যকে আমরা ভ্রূক্ষেপ না করলেওযুদ্ধের সংজ্ঞা সম্পর্কে মতানৈক্যের দ্বিতীয় কারণএটাও বর্ণনা করা হয়যে, যুদ্ধের কোনো সংজ্ঞাই পরিপূর্ণভাবে যুদ্ধের সমস্ত দিকগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে না।আজ পাশ্চাত্যের যুদ্ধ সংক্রান্ত পারদর্শীরা যুদ্ধের যে সংজ্ঞাকে সাধারণতঃ মেনে নিয়েছে তাকে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংজ্ঞা বলা যেতে পারে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ**"যখন দুই বা ততোধিক দলের মধ্যে যুদ্ধের মাকসাদে উয্মা একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক হয় এবং কেউ কাউকে ছেড়ে দিতে রাজি হয় না তখন এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্বের ফলে যদি দুই পক্ষ সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করে তখন এই অবস্থাকে যুদ্ধ বলা হয়।"**

যুদ্ধের এই সংজ্ঞাকে প্রত্যক্ষসংজ্ঞা বলা হয়। এই সংজ্ঞার মধ্যে যেমনি কিছু ভালোর দিক আছে তেমনি এরমধ্যে কিছু মন্দের দিকও আছে। এই সংজ্ঞাকে প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা বলার কারণ এই যে, এই সংজ্ঞাকে সামনে রাখলে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে সহজ হয়। এই সংজ্ঞায় যুদ্ধের উভয় পক্ষের কথা উল্লেখ রয়েছে।

❖যুদ্ধের পরিভাষাঃ

যুদ্ধের সংজ্ঞা দ্বারা এই বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে যে, যুদ্ধের মধ্যে দুই দলের মাকাসিদে উজমার একে অপরের সাথে লড়াই হওয়াতে একে অপরের সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে সশস্ত্র সংঘর্ষের রুপ নেয়।এই সংজ্ঞার দ্বারা কতিপয় যুদ্ধের পরিভাষা আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। সেই সাথে কিছু ধারণাও আমাদের সম্মুখে আসে যা বুঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। এর গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো:

❖যুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষঃ

যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরির জন্য একের অধিক এমন দল বা গ্রুপ থাকা জরুরী যারা নিজেরা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।মানুষের এই দলগুলো ব্যক্তি, গোত্র, জাতি অথবা দেশ হতে পারে। এই পক্ষ-বিপক্ষ দুই ধরনের হতে পারে যথা আভ্যন্তরীণ এবং বর্হিগত। আভ্যন্তরীণ পক্ষ-বিপক্ষ একই সমাজের, একই জাতি থেকে সম্পর্ক থাকতে পারে। বর্হিগত পক্ষ-বিপক্ষ তারা যারা অন্য সমাজের বা জাতির লোক হয়ে থাকে। অনুরুপভাবে একটি যুদ্ধে অনেকগুলো দল থাকতে পারে যারা একে অপরের বন্ধু ও শত্রু হতে পারে। এই অবস্থাতে সন্ধি-চুক্তির সাক্ষর হতে পারে। সমস্ত কাজেকর্মে একে অপরের সাহায্য করে থাকে। এই জন্য যুদ্ধের ময়দানে বন্ধু ও শত্রু যাচাই বাছাই করার জন্য একটা মানদন্ড থাকা প্রয়োজন।

❖*যুদ্ধে বন্ধু ও শত্রুদের পরিক্ষা করার মাপকাঠী মানদন্ড*

যুদ্ধশিল্পের কলা-কৌশল অনুযায়ী যুদ্ধে বন্ধু ও শত্রুদের বেলায় সাধারণতঃ যে মাপকাঠি নির্ণয় করা হয়ে থাকে তা অত্যন্ত সহজ যা ইতিপূর্বেই বর্ণীত হয়েছে। যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যাকে মাকাসিদে উজমা বলা হয় তা সফল করার পথে যদি কোনো বাধাবিঘ্ন এসে যায় তাকে দূর করা। এ যুদ্ধের বেলায় যে শক্তিগুলোকোনো এক যুদ্ধপক্ষের সাহায্যে আসে তাদেরকে বন্ধু বলা হয় এবং যারা এর পথে বাধা সৃষ্টি করে তাদেরকে শত্রু বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ ব্যাপারে দু'টি প্রতিবদ্ধকতাও বিদ্যমান রয়েছে। প্রথমতঃ এই যে, কতিপয় ঘনিষ্ট বন্ধু এবং কট্টর শত্রুদের ছেড়ে সমাজের অবশিষ্টলোকদেরকে তাদেরদৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বন্ধু ও শত্রু এবং নিরপেক্ষ লোকদের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ নয়।দ্বিতীয়তঃ বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে পার্থক্যেরঅনুমতি কাকে দেয়া হবে।মুসলমান ব্যতিত বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে পার্থক্যের এই অনুমতিকখনো বাদশাহের কাছে,কখনো পার্লামেন্টের কাছে এবং কখনোধর্মীয় নেতাদের কাছে দেয়া হয়ে থাকে।এই শক্তিগুলো যাদেরকে বন্ধু বলে আখ্যায়িত করবে তারা বন্ধু এবং যাদেরকে শত্রুরূপে আখ্যায়িত করবে তারা দুশমন হিসাবে পরিগণিত হবে। কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য জীবনের সকল ব্যাপারে

প্রকৃত ফয়সালা ইসলামী শরীয়াহ করবে। মুজাহিদীনদের জিহাদের মাকাসিদে উয্মাও শরীয়াহনির্ধারিত করে রেখেছে। বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মাপকাঠিও "ওয়ালায়াহওয়া বারায়াহ" এর আক্বিদার পরিপেক্ষিতে ইসলামী শরীয়াহ নির্ধারণ করে দিয়েছে। অর্থাৎ একজন মসলমানেরবন্ধুত্ব ও শত্রুতা আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে।তারা এ বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মাপকাঠিকোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে, কোনো জাতিগত ভাবে, কোনো ভাষাগত ভাবে, কোনো দেশের স্বার্থে, কোনো গোত্রের স্বার্থে, কোনো দলের স্বার্থে, কোনো সংগঠনিক স্বার্থে অথবা কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থে নির্ধারণ করে না। আমেরিকাতে মুসলমান হলে সে তার বন্ধু হবে এবং কাফের যদি তার নিজের রক্তের ভাইও হয় তবুও সে তার শত্রুই হবে।স্বভাবতঃ যখন কাফেরদের সাথেমুসলমানদেরযুদ্ধ শুরু হবে তখন তারা নিজেদের মতানৈক্য দূর করে তাদের বিরুদ্ধেসবাই বর্জমুষ্টি হয়ে দাড়াবে।অতএবযুদ্ধশিল্পের প্রবর্তীত অন্যান্য মাপকাঠি যুদ্ধচলাকালিন বন্ধু ও শত্রুদের নির্ণয়ের ব্যাপারে একজন মুসলিমের সহায়ক তো হতে পারে কিন্তু চুড়ান্ত ফয়সালা কখনো হতে পারে না। মুসলমানদের জন্য শরীয়াহই হবে প্রকৃত মাপকাঠি।

❖ *দ্বন্দ্ববা মতানৈক্য বা মতবিরোধ*

দু'দলের উচ্চতর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরস্পরে সংঘর্ষিত হওয়াকে মতবিরোধ বা মতানৈক্য বলা হয়। যদি কোনো পক্ষ বা দল এই মতবিরোধকে দূরিভূত করতে এবং স্বীয় উদ্দেশ্যকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত না হয় তাহলে এমন পরিস্থিতিকে যুদ্ধ সম্পর্কিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মতানৈক্য হিসাবে আখ্যায়ীত করে। মতবিরোধ বা মতানৈক্য যুদ্ধের সূচনা মনে করা হয়। যুদ্ধের সৃষ্টি মতানৈক্য হতে শুরু হয় এই জন্য মতানৈক্য এবং তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে বিস্তারিতভাবে বুঝার প্রয়োজন।

❖ *দ্বন্দ্বের / মতানৈক্যরপ্রকারভেদ*

মতানৈক্যর প্রকারভেদ বা মতানৈক্যর ধরণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) কারণগত অর্থাৎ দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ অনুযায়ীযুদ্ধে প্রকারভেদ

(২) দলিয় অর্থাৎ পক্ষ বিপক্ষ অনুযায়ী যুদ্ধের প্রকারভেদ

অধিকাংশ সময় মতানৈক্যর এই দু'টি ধরণই একই সাথে মতবিরোধে উপস্থিত থাকে। নিম্নে মতানৈক্যর এই দু'টি দিকের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

❖*কারণগত অর্থাৎ দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ অনুযায়ী যুদ্ধের প্রকারভেদ*

এর উদ্দেশ্য হলো সেই সকল কারণগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা যা প্রকৃতপক্ষে মতানৈক্যর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণগুলো নিম্নে বর্ণিত কারণ হতে পারে।

(১) আদর্শিক দ্বন্দ্ব
(২) চিন্তাধারার প্রার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বন্দ্ব
(৩) ব্যক্তিগত অভিরুচির তারতম্যের কারনে দ্বন্দ্ব
(৪) প্রত্যক্ষ বা আমলী দ্বন্দ্ব
(৫) সামাজিক প্রার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বন্দ্ব
(৬) অর্থনৈতিক
(৭) ভৌগলিক
(৮) শক্তি অর্জন করার ব্যাপার নিয়ে দ্বন্দ্ব
(৯) আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে

মতানৈক্যর কারণগুলো নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো।

❖ *আদর্শিক দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ*

মানব সমাজে সব চাইতে বেশি দ্বন্দ্ব বা মতানৈক্য আদর্শিক কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। আদর্শিক দ্বন্দ্ব বা আক্বিদাগত মতবিরোধের বিভিন্ন দিক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যেমন হক বাতিলের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সত্য মিথ্যার লড়াই। আল-কোরআন এই মতানৈক্য বা দ্বন্দ্বকে [**تكوينى**] সুন্নত বলে আখ্যায়ীত করেছে যে,হক ও বাতিলের মাঝে লড়াই আগেও ছিলো এবং এখনো বলবৎ রয়েছে এবং সর্বদা তা বলবৎথাকবে, এটা চিরাচরিত নিয়ম। সত্যের প্রকৃতি [nature] হলো বাতিলকে হুমকি দেয়া, বাতিলের চিন্তাধারার মূলকে দলিলের মাধ্যমে খন্ডন এবং তার অর্থতৈিক মূল্যবোধকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নস্যাৎ করার চেষ্টা করা। বাতিলের প্রকৃতিও তাই সে সত্যকে এবং সত্যের ধারক বাহকদের দুর্বলতম সত্তাকেও বিপদজনক মনে করে এবং সব ধরনের জুলুম ও অত্যাচারের মাধ্যমে সত্যকে ও সত্যবাদীদের কণ্ঠকে চেপে রাখার চেষ্টা করে। এভাবেই হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হয়ে থাকে। মুসলমানদের সাথে অন্যান্য বাতিল মতাদর্শের মতানৈক্যর মূলতঃ এটাই কারণ। এমনিভাবে আদর্শগত দ্বন্দ্ব দু'টি বাতিল মতবাদ ও বাতিল দ্বীনের মাঝেও হতে পারে যেখানে একটি বাতিল মতবাদ অন্য আরেকটি বাতিলমতবাতের অনুসারীদের প্রতি স্বীয় মতবাদ জোরপূর্বকচেপে দিতে চায়। অতএব এই দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ প্রকৃতগতভাবে ধর্মীয়ও হতে পারে এবং অধর্মীয় হতে পারে। ধর্মীয় আদর্শগত মতানৈক্যর উদাহরণ ইউরোপীয় ইতিহাসে ইহুদী ও খৃস্টানদের মাঝে প্রবর্তীত দ্বন্দ্ব বা মতানৈক্য এবং বিধর্মীয়দের মাঝে সৃষ্ট মতানৈক্যর উদাহরণ সমাজতন্ত্র ও পূঁজিবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। এই সমস্ত মতবিরোধ সাধারণতঃ বিধর্মীদের মধ্যেঐ সময় দেখা দেয় যখন সেই বিধর্মীয় মতবাদকে কোনো জাতি বা কোনো দল ধর্মের ন্যায় অনুসরণ করে। এ পর্যন্ত আমরা দু'টি বা দুইয়ের অধিক ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছি যাকে "বায়নাল মাযাহেব" অর্থাৎ ধর্মীয়

দ্বন্দ্ব বা মতানৈক্য বলা হয়। দ্বিতীয় ধরনে আদর্শিক দ্বন্দ্ব আভ্যন্তরিন ধর্মীয় দ্বন্দ্ব হিসাবে আখ্যায়ীত করা হয়। আভ্যন্তরিন ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের মাঝে যুদ্ধের ভিত্তিও হয়ে ছিলো যেমন ইহুদী ও খৃস্টানদের বিভিন্ন দলের মধ্যকার দ্বন্দ্বসমূহই এর প্রমাণ।কিন্তু ইসলামে এমন হয়নি হাঁ ঐ সকল দলসমূহ ছাড়া যাদের সাথে দ্বীনের মৌলিক বিধি-বিধানে মতানৈক্য বেড়ে যাওয়ার কারণে দ্বীন অথবা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত হতে বহিস্কৃত হয়ে মুরতাদ, যাকাত প্রদানে অস্বীকারী, খারেজী এবং শিয়া সম্প্রদায়ের মাঝে হয়েছিলো।

জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ (National States) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে (বায়নাল মাযাহেব) বিভিন্ন ধর্মের মাঝে আদর্শিক দ্বন্দ্বই ছিলোযুদ্ধের সব চাইতে বেশি মূল কারণ। আজও উন্মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলে বুঝা যায় যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতানৈক্যর আড়ালে সংঘটিত যুদ্ধের প্রকৃত পটভূমি (বায়নাল মাযাহেব) দুই বা ততোদিক ধর্মের মাঝে আদর্শিক দ্বন্দ্বই হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এই সমস্ত আদর্শিক দ্বন্দ্বসমূহের শিকড় অত্যন্ত গভীর হয়ে থাকে বিধায় এর কারণে সংঘটিত যুদ্ধসমূহও শতাব্দীতে বেষ্টিত হয়। এই সমস্ত যুদ্ধের মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিকও অন্যান্যদ্বন্দ্বসমূহের কারণে সংঘটিতযুদ্ধসমূহের দিকগুলো হতে ভিন্নতর হয়ে থাকে। মুসলমানরা নবী করিম (সাঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) এর আমল এবং তাদের পরবর্তী শতাব্দীর শুরুতে কাফিরদের অঞ্চলগুলোতে যে সমস্ত হামলা চালানো হয়েছিলো এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিজয় অর্জিত হয়েছিলো তার ভিত্তি আদর্শিক দ্বন্দ্বই ছিলো। এমনিভাবে ক্রুসেডার যুদ্ধসমূহের ভিত্তিও আদর্শিকই ছিলো।

❖চিন্তাধারার প্রার্থক্য

এই দ্বন্দ্বসমূহও এক দিক দিয়ে আদর্শিক দ্বন্দ্বেরই অন্তর্ভূক্ত কিন্তু আদর্শিক দ্বন্দ্বের অনুপাত হিসাবে এতে বেশি প্রসস্ত ও গভীরতা পাওয়া যায় না এবং অধিকাংশ এটা একটা সাময়িক ধ্যান-ধারনার ফলই হয়ে থাকে। এই দ্বন্দ্বের সূচনায় এর মিমাংসা সহজ হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ সময় এই সমস্ত কলহসমূহ রাজনৈতিকভাবেনিস্পত্তি করে নেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই পরিস্থিতি যদি বলবৎ থাকে তাহলে দ্বন্দ্বের নিস্পত্তি না হওয়ার কারণে এই দ্বন্দ্ব আদর্শিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়ে থাকে এবং অবশেষে এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরিণত হয়।
এই মতানৈক্যসমূহ দেশের কতিপয় আইন সম্পর্কে হতে পারে যাকে কোনো ব্যক্তি বা দল স্বীয় ক্ষতির কারণ অথবা নিজেদের আক্বিদার সাথে সংঘর্ষ মনে করে। এই সমস্ত দ্বন্দ্বসমূহ বেশিরভাগ আভ্যন্তরিন দ্বন্দ্বই হয়ে থাকে। এই সকল দ্বন্দ্ব দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে পরে যা গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ পাশ্চাত্যে গির্জা ও জমিদার প্রথার বিরুদ্ধে সেখানকার জনগণের বিদ্রোহকে বলা যেতে পারে।এক দিক দিয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বলোচিস্তানের জনগণের যুদ্ধও প্রায় উপরোল্লেখিত যুদ্ধের মতোই।

❖ব্যক্তিগত অভিরুচি

এই ধরনের দ্বন্দ্বসমূহ বেশির ভাগ সেই সময় দেখা দেয় যখন দলগুলোর নিকট বড় ধরনের কোনো উদ্দেশ্য লক্ষ্য থাকে না বরং তাদের ছোট্ট খাটো উদ্দেশ্যের কারণে এই দলগুলো নিজেদের ব্যক্তিসত্তাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই ভাবে তারা নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের নিস্পত্তিতে সক্ষম হয় না। যার কারণে অবশেষে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।মানুষের মানুসিকতাই এ সব দ্বন্দ্বের মূল কারণ। উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় লোক তাদের বিশেষ মনভাবের কারণে অন্যান্যপক্ষের লোকদের সাথে সাক্ষাৎবা যোগাযোগ করতে পছন্দ করে না। যার পরিপ্রেক্ষিতে ভূল বোঝাবোঝির সৃষ্টি হয়। এ থেকে নানা রকমের দ্বন্দ্ব জন্ম নেয়। এই ধরনের দ্বন্দ্ব সাধারনতঃ গোত্র অথবা ছোট্ট ছোট্ট

দলগুলোর মধ্যে লেগে থাকে। বড়ো বড়ো দেশ ও জাতীয় পর্যায়ে এই ধরনের দ্বন্দ্ব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বসমূহ এ কারণেও সৃষ্টি হতে পারে যে, দুই পক্ষের নেতৃত্ব পর্যায়ের ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে কাজ করতে কষ্টবোধ করে এবং মনমানুসিকতার ভিন্নতার কারণে অথবা পরস্পর একে অপরকে উপলব্ধি না করার কারণে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় যা আবার তাদের ব্যক্তিগত আওতায় সীমাবদ্ধ থাকে না বরং দু'দলের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। কিন্তু প্রথমে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের দ্বন্দ্বসমূহ সাধারণতঃ ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপারাধীতে পরিলক্ষিত হয়। কোনো বড়ো উদ্দেশ্য লক্ষ্য অর্জনের জন্য নয়।

❖*প্রত্যক্ষ বা আমলী দ্বন্দ্ব*

কোনো ছোট্ট অথবা কোনো বড়ো কার্য সম্পাদন কালে কাজের নীতি বা পদ্ধতি নির্ধারণে মতো পার্থক্য, উক্ত কর্মে অসহযোগিতাঅথবা উক্ত কাজে দায়িত্ব পালন না করায় এই সমস্ত মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রত্যক ব্যক্তি, প্রত্যক গোত্র, প্রত্যক জাতি এবং প্রত্যক সংগঠনের কাজ করার প্রদ্ধতি সাধারণতঃ অন্যদের থেকে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোনো এক দল একই ধরনের কাজকে কোনো এক পদ্ধতিতে করতে চায়আর অন্যদল সেই কাজকে অন্য কোনো পদ্ধতিতে করতে চায়। তাই এই কর্মপদ্ধতির ভিন্নতার দরুন অনেক সময় দ্বন্দ্বের কারণে পরিণত হয়। এমনিভাবে দু'দল পরস্পরে কোনো কাজে সহযোগিতা না করার কারণেও দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যখন এক দল অন্য দলের নিকট বিপদে সাহায্য চায় অথবা তার ভূখন্ড ব্যবহার করার অনুমতি চায়কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তাকে অনুমতি দিতে সম্মত হয় না। এই অসহযোগিতাই দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে যদি একদল অন্য দলের সাথে পারম্ভে সহযোগিতা করার পর পিছটান দেয় তখনও এই ধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার এটাও একটি দিক রয়েছে যে, দু'পক্ষ পরস্পর কতিপয় ব্যাপারে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কারেণে উভয়ের প্রতি কিছু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে কিন্তু যখন

কোনো এক পক্ষ স্বীয় দায়িত্ব পালনে তৎপর হয় না তখন তা দ্বন্দ্বের কারণে পর্যবসিত হয়।

❖ সামাজিক কর্মতৎপরতার প্রার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বন্দ্ব

প্রত্যেক সমাজের কোনো না কোনো নিজস্ব বৈশিষ্ট থাকে যা তার বিশেষ সামাজিক পটভূমি এবং ঐতিহ্যগত সামাজিক প্রথা ইত্যাদি হতে সৃষ্টি হয়।বিভিন্ন বৈশিষ্টের অধিকারী সমাজসমূহের পারস্পরিক আদান-প্রদান কালে এমন সামাজিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ারপরিপূর্ণ সম্ভাবনাথাকে। কেননা একই কাজ কতক সময় এক সমাজে ভালো মনে করা হয়। অন্য সমাজে সেই কাজকে মন্দ বলে অভিহিত করা হয়, শুধু তাই নয় সেই কাজকে অপরাধ বলে আখ্যায়ীত করা হয়। অনুরূপএক সমাজের মধ্যেও তার ভিতরগত প্রথা ও বিশেষ ধ্যান-ধারণা বলবৎ থাকার কারণে সামাজিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। মান-সম্মানের নামে হত্যা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম নেয়া দ্বন্দ্ব এমনিভাবে বিশেষ সামাজিকতার মাঝে আত্ম-গৌরবের বিশেষ পরিস্থিতি এবং নারীদের বিবাহ-ত্বালাকের ন্যায় সামাজিক দিকও দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে থাকে। এ সব দ্বন্দ্বসমূহ কাবাইলী এবং পল্লি অঞ্চলে অহরহ বিদ্যমান রয়েছে।

❖ অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব

মানব সমাজে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব পুরাতন কাল হতেই চলে আসছে। এই মতবিরোধ ও মতানৈক্য তিনটি বস্তুর চতুর দিকে ঘুরছে। প্রথমতঃ সেই অর্থনৈতিক উৎস যা মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন জল উৎস অথবা কৃষি বিষয়ক উৎসসমূহ। দ্বিতীয়তঃ সেই সমস্ত উৎসসমূহ যা কোনো দল বা মানুষের জন্য শক্তির কারণ হতে পারে উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যেমন খনিজ প্রদার্থ এবং অন্যান্য শক্তি যোগানোর উৎসসমূহ। তৃতীয়তঃ সেই সমস্ত নিরাপদ পথ যার মাধ্যমে দ্রব্য সামগ্রী মানুষের নিকট পৌছায় যাকে বানিজ্যিক পথও বলা হয়। তন্মধ্যে জলপথ বিশেষ গুরুত্বে অধিকারী। এই দ্বন্দ্ব সেই সময় জন্ম নেয় যখন দুই অথবা দুইয়ের অধিক পক্ষের জন্য দ্রব্য-সামগ্রী অর্জনের স্থান একই হয়ে থাকে। যখন এক পক্ষের

উৎসের ওপর অন্য পক্ষের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়। পাকিস্তানে প্রদেশসমূহের মাঝে "কালাবাগ ডেম" এবং স্থল কেনাল" এর ঝগড়ার ভিত্তি অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। ইরাকের ওপর আমেরিকার হামলা আক্বিদাগত বুনিয়াদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিতার তেলের ওপর আধিপত্যবিস্তার করাও ছিলো।গরম পানি পর্যন্ত পৌছার ইচ্ছাই আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগমনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলো। কতক সময় এই দ্বন্দ্ব এজন্যও জন্ম নেয় যে, এক দল বা এক জাতি যৌথভাবে কিছু সম্পদ ব্যবহার করতে ছিলো। অতপর কোনে রাজনৈতিক, কাবাইলী অথবা উত্তারাধিকারী পরিবর্তনের ফলে এই সম্পদ অন্যায়ভাবে বন্টন হয় অথবা কোনো এক পক্ষ সে নিজে নিজেকে সেই সম্পদের বেশি অধিকারী মনে করে। যার ফলে এক দ্বন্দ্ব জন্ম নেয় যার মূল কারণও অধিকাংশ সময় অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বই হয়ে থাকে।সম্পদের অসুষ্ট বন্টনই কতক সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মাঝে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর কয়লার খনি ফ্রান্সকে দেয়া হয়, অন্যদিকে জার্মানীকে কয়েক ভাগে ভাগ করে অন্যান্য দেশকে দেয়া হয়। এই বন্টনকে জার্মানী নিজের সাথে অন্যায় হয়েছে বলে আখ্যায়ীত করে এবং একে ভিত্তি করে 'হিট্লার' ক্ষমতায় আসে। যার ফলে এই দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। অনুরূপ সম্পদের অসুষ্ট বন্টন দেশের আভ্যন্তরীণদ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।পাকিস্তানে জন্ম নেয়া দু'টি বড়ো দ্বন্দ্ব অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান এবং বলুচিস্তানের সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পদের অসুষ্ট বন্টনই ছিলো।এমনিভাবে ওয়াছতের অর্থাৎ অসুষ্ট বন্টনই অনেক পরিবার এবং কবিলার মাঝে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এভাবে অর্থনৈতিক অসুষ্ট বন্টন জাতির মধ্যে বঞ্চিতের অনুভূতি জন্মায়। এই বঞ্চিতের অনুভূতি অনেক বার দ্বন্দ্ব হতে অগ্রসর হয়ে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের আকার ধারণ করে।

❖*ভৌগলিক দ্বন্দ্ব*

এই দ্বন্দ্বসমূহের সাধারণতঃ দুইটি ভিত্তি হয়ে থাকে। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক দ্বিতীয়তঃ প্রতিরক্ষামূলক। ভৌগলিক স্থান অধিকাংশ সময় বিশেষ অর্থ উপার্যনের জন্য

গুরুত্ববহ হয়ে থাকে। যেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণস্থলপথ অথবা কোনো বানিজ্যিক সড়ক কিংবা কোনো সামদ্রীক বন্দরকে স্বীয় দখলে নেয়া, এমনিভাবে নদীর উৎসকে দখল করে নেয়া, নিরাপত্তার দিক দিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়ের চূড়াকে দখলে নেয়া অথবা শত্রুদের রসদ (মাল-পত্র) আনা নেয়ার পথে বাধা বিগ্ন সৃষ্টি করা অথবা শত্রুদের লক্ষ্যবস্তুকে স্থির করার জন্য তাদের বিশেষ অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা ইত্যাদি। সুইস খালের ঝগড়া এই প্রেক্ষাপটে বুঝা যেতে পারে। নদীর উৎস দখলের দ্বন্দ্বই কাশ্মীরের যুদ্ধেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।নিরাপত্তার দিক দিয়ে গুরুত্ববহ ভৌগলিক স্থানের ওপর আধিপত্য কায়েম করার দ্বন্দ্বই পাকিস্তান ও ভারতের মাঝে 'সিয়াচীন গ্লিসার' এর যুদ্ধের কারণ।

❖*শক্তি অর্জনের ব্যাপারে দ্বন্দ্ব*

মানব ইতিহাস এমন দ্বন্দ্বসমূহে পরিপূর্ণ।যখন মানব দল ক্ষমতা দখলের জন্য পরস্পরে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। অতীতে শাহী বংশের রাজপুত্রদের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ, বিভিন্ন জাতি গোত্রের পারস্পরিক যুদ্ধ অথবা বিভিন্ন রাজা বাদশাহদের মাঝে পারস্পরিক যুদ্ধের ধরণ শক্তি অর্জনের কারণই ছিলো। আধুনিক বিশ্বেও এই ধরণের দ্বন্দ্ব কোনো না কোনো আকারে বিদ্যমান রয়েছে।আজকের রাজনৈতিক দলসমূহের লড়াইও শক্তি অর্জনেরই অন্তর্ভূক্ত। দেশ ও জাতির পর্যায়ের এই সমস্ত দ্বন্দ্বসমূহের ভিত্তিগুলোও অধিকাংশ আদর্শিক অথবা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো সময় কোনো বড়ো ধরনের উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে দেশ বিজয়ের অভিলাষই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যা অন্যান্য পক্ষের সাথে দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

❖ *আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দ্বন্দ্ব*

দেশ ও জাতি অথবা গোত্রসমূহের মাঝে নিজ নিজ আত্মরক্ষা অথবা সশস্ত্র অভিযানও দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে থাকে। এক পক্ষ নিজের নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করার জন্য বিশেষ ভৌগলিক স্থান দখল করার চেষ্টা করে যা দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতি সম্পর্কে অন্য পক্ষ কোনো কোনো সময়খারাপ ধারণা পোষণ করে যা দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পারমানবিক বোমা বানানোর প্রস্তুতি, আকাশ পথে রকেট নিক্ষেপ এবং বিশেষ ধরনের আধুকিন অস্ত্রের ক্রয় অথবা উৎপাদন এ সব কিছুই অধিকাংশ দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, সাম্প্রতিক পারমানবিকঅস্ত্র তৈরির ব্যাপারে ইরান আমেরিকার মধ্যে দ্বন্দ্ব অথবা আকাশ পথে স্যাটালাইট প্রেরণ করার ব্যাপার নিয়ে আমেরিকা ও উত্তর কোরিয়ার মাঝে দ্বন্দ্ব চলছে।

❖ *প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা*

এখানে এ ব্যাখ্যা করাপ্রয়োজন যে,আমরা দ্বন্দ্বগুলোর সমস্ত প্রকারভেদযুদ্ধ শিল্পের চিন্তাধারা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলাম। এগুলো সেই সমস্ত দ্বন্দ্বসমূহ যা গতানুগতিকভাবে মানব সমাজে সংঘটিত হচ্ছে এবং মানব ইতিহাসেও অহরহ সংঘটিত হয়ে আসছে। বস্তুতঃ এই দ্বন্দ্বসমূহের মধ্যে শরীয়াহ অনুযায়ী কোনটি প্রশংসনীয় আর কোনটি অপ্রশংসনীয় এবং প্রতিটি দ্বন্দ্বে কে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর কে মিথ্যার ওপর। এ সবগুলো ফিকহুল জিহাদ অর্থাৎ জিহাদ বিষয়ক গভীর জ্ঞান সম্পর্কীত বস্তু। এর জন্য শরীয়াহ সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদের থেকে ফতোয়াহ এবং শরয়ী দিকনির্দেশানা নিতে হবে। আমরা এখানে দ্বন্দ্বের যে সকল প্রকারভেদ বর্ণনা করলাম তা মুজাহিদীনদের কাজের ভিত্তি হতে পারবে না।তবে এই সমস্ত দ্বন্দ্বের প্রকারভেদের জ্ঞানআমাদেরকে আমাদের প্রতি কাফিরদের আক্রমণসম্পর্কে অথবা তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হওয়ার প্রকৃত

কারণ বুঝার এবং ভালোভাবে তাদের সাথে লড়াই করতে আমাদেরকে সাহায্য করবে।

❖ *দ্বন্দ্বের দলীয় প্রকারভেদ*

দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় প্রকারকে মানব দলীয় ভিত্তিতে ভাগ করা যায়, অর্থাৎ দুই ব্যক্তির মাঝে দ্বন্দ্ব, দুই গোত্রের মাঝে দ্বন্দ্ব এবং দুই দেশের মাঝে দ্বন্দ্ব। আমরামানব দলীয় ভিত্তিতে ভাগ করার সময় দ্বন্দ্বের কারণসমূহের চাইতে বেশি দ্বন্দ্বে অংশগ্রহনকারী দলের প্রতি দৃষ্টি রাখবো যদিও এই সমস্ত দলীয় দ্বন্দ্বের পিছনেও কোনো না কোনো স্বচ্ছ কারণসমূহ নিহিত রয়েছে যেমনঃ দুই দেশের মধ্যে ভৌগলিক দ্বন্দ্ব অথবা দুই ব্যক্তির মাঝে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব অথবা দুই জাতি বা দুই ধর্মের মাঝে আদর্শীক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

দলীয় ভিত্তিতে যে দ্বন্দ্ব বাধে তা নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব

(২) গোত্রীয় দ্বন্দ্ব

(৩) জাতীয় বা ধর্মীয় দ্বন্দ্ব

(৪)রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব

নিম্নে দলীয় দ্বন্দ্বের প্রকারভেদগুলোকে বিস্তারিতভাবেবর্ণনা করা হলো।

❖ *(১) ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব*

যখন দুই অথবা দুইয়ের অধিক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে কোনো দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে তখন এই দ্বন্দ্বকে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বলে অভিহিত করা হয়।ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সাধারণতঃ আর্থিক, সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত আচার আচরণের সাথে সম্পর্কীত হয়ে থাকে।

❖ *(২) গোত্রীয় দ্বন্দ্ব*

গোত্রীয় দ্বন্দ্বও অধিকাংশ সময় অর্থনৈতিকই হয়ে থাকে উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, চাষ-আবাদের যোগ্য জমিন, পানি এবং পশুপালনের যোগ্য খেত-খামার নিয়ে দ্বন্দ্ব। এই সমূহদ্বন্দ্বে গোত্রীয় অহংকারই বেশি দেখা যায়। অধিকাংশ সময় এই সমস্ত দ্বন্দ্বকে গোত্রীয় প্রথা অনুযায়ী জীবিত রাখা হয়। অধিকাংশ গোত্রীয় দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের মতই হয়ে থাকে। কাবাইলে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বও পাওয়া যায়। এই সমস্ত দ্বন্দ্বসমূহ কখনো কখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে হয়ে থাকেঅথবা এর পরিপ্রেক্ষিতে ছোট্ট ছোট্ট দলের সৃষ্টি হয়।যদি এই সমস্ত দ্বন্দ্বের নিস্পত্তি না হয় তাহলে কাবাইল বা গোত্রে ফাটল ধরে এবং নতুন নতুন কাবাইলের রূপধারন করে অথবা গোত্রের নতুন শাখার উৎপত্তি ঘটায়। অধিকাংশ কোনো বড়ো কাবাইলের শাখা প্রশাখা এই পদ্ধতিতেই জন্ম নেয়। পরে এই শাখা নিজেই একটি স্থায়ী গোত্র হিসাবে অন্যান্য শাখা প্রশাখার সাথে আদান প্রদান করে।

❖ *(৩) জাতীয় বা ধর্মীয় দ্বন্দ্ব*

এই দ্বন্দ্বসমূহ অধিকাংশ আর্দশিক হয়ে থাকে। যার ফলে দুইটি ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী জাতি পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। যেমন মুসলিম এবং ক্রুশেডারদের মাঝে কয়েক দশক ধরে সালিবী (ক্রুশেড) যুদ্ধ চলে আসছে। অনুরূপ কোনো কোনো সময় কোনো জাতিকে স্বীয় আদর্শ প্রচারের চেয়ে বেশি নিজের বাহাদুরী দেখানো এবং অন্য জাতিকে পরাভূত করার ইচ্ছাই জাতীয় দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে থাকে।

❖ *(৪) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দ্বন্দ্ব*

এই দ্বন্দ্বসমূহ কখনো আদর্শিক, কখনো অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক আবার কখনো কখনো সামজিক হয়ে থাকে। ইংরেজদের আধিপত্যবাদী আমলের অবসান ঘটার পর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমূহের মাঝে ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বই প্রচুর দেখা গেছে। দেশগুলোর অপ্রাকৃতিক বিভক্তির কারণে তাদের মাঝে জল ও স্থল, কৃষি এবং ঘনিজ সম্পদনিয়ে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে।এমনিভাবে যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মাঝে শক্তির ভারসাম্য না থাকে তাহলে শক্তিশালী দেশ দুর্বল দেশের অর্থনৈতিক অথবা নিরাপত্তাবাহী ভৌগলিক স্থানকে দখল করে নিতে চেষ্টা করে যা ভৌগলিক দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে যদি দুইটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের অধিকারী হয় তাহলে পরস্পর একে অপরকে স্বীয় আদর্শের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে আর এ প্রচেষ্টাই আদর্শিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। পাকিস্তান এবং ভারত এর মাঝে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বা ধরন অনুরূপ। এই সকল আধুনিক রাষ্ট্রেসমূহে আভ্যন্তরিন গোলযোগও প্রচুর দেখা যায়। কতিপয় দেশ একের অধিক জাতি বা গোত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রগত জাতিয়তাবাদের অকৃত্রিম এবং শরীয়ত বিরোধী চিন্তাধারা সেই সকল প্রাকৃতিক জাতি ও গোত্রকে জড়িত করতে পেরেছে আর না তাদের মধ্যে ভালোবাসা এবং ঐক্যমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে একদিকে শক্তিশালী জাতি বা গোত্র অন্যদের অধিকার মারার চেষ্টা করে অপরদিকে অন্যান্য জাতি বা গোত্রের মাঝে বিবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে অথবা পাঞ্জাবী ও বলোচদের দ্বন্দ্বসমূহ এরই অনুরূপ।

❖ *সমস্যার সমাধান*

কাফিরদের আসকারী পারদর্শীরা সমস্যা সমাধানের কয়েকটি উপায় উল্লেখ করেছে এবং এ সব উপায়ের সারমর্ম হলো এই যে, এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষ নিজ নিজ মাকাসেদে উজমা বা উচ্চতর উদ্দেশ্যের কোনো না কোনো স্থানে অপর পক্ষের কিছু দাবী মেনে নিয়ে পরস্পরে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে সমস্যার সমাধান করবে। দ্বিতীয়তঃ

দ্বন্দ্বের নিস্পত্তি হলো এই যে, উভয় পক্ষ পরস্পর একে অপরের সাথে মিলে যৌথভাবে উচ্চতর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সন্ধিতে আবদ্ধ হয়ে দ্বন্দ্বের অবসান করবে। এটা তখনই সময় সম্ভব যখন উভয় পক্ষ একই মতাদর্শবা একই ধর্মের অধিকারী হবে এবং তাদের মাঝে ছোটখাট বোধগম্য ব্যাপার নিয়ে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিলো। তৃতীয়তঃ দ্বন্দ্বের মিমাংসা এই ভাবে হতে পারে যে, কোনো মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে হবে যাতে করে উভয় পক্ষের জন্য নিজ নিজ উদ্দেশ্য অথবা উদ্দেশ্য লক্ষের কোনো বড়ো অংশ অর্জন করার পথ বের হয়। এটাও তখনই সম্ভব যখন উভয় পক্ষের মাকসাদে উজ্মা এতো বেশি সাংঘর্ষিক ও বিপরিত মূখী না হয় যা কোনো প্রকারেই নিস্পত্তির যোগ্য নয়। কখনো কখনো দ্বন্দ্ব এতো বেশি প্রকট আকার ধারণ করে না যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করলেই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে যায়। যদি উপরোক্ত পদ্ধতি মধ্য হতে কোনোটাই কাজে না আসে তাহলে উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধের আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়। কাফিরদের নিকট সমস্যা সমাধানের কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হলো।

(১) (প্রতিপক্ষকে) জায়গা প্রদান করা।

(২)(প্রতিপক্ষের সাথে) মিলে মিশে কাজ করা।

(৩)(প্রতিপক্ষের সাথে) মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা।

(৪) (দ্বন্দ্বের প্রতি) অমনোযোগী হওয়া।

(৫)(প্রতিপক্ষের সাথে) যুদ্ধে লিপ্তহওয়া।

❖ *প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা*

এখানেও কিছু কথা পরিস্কার করে দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি তা হলো এই যে, কাফিররা যখন ইচ্ছা করবে তখন তারা উপরোক্ত সমস্যার সমাধান অনুযায়ী যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদের দ্বন্দ্বের মিমাংশা করে নিবে। কেনোনা তারা

সার্বজনীন ট্রোথ (সত্য) বা কোনো অহির পক্ষপাতী নয় যা খন্ডন করা তাদের পক্ষে সমীচীন নয়, তারা তো শুধুমাত্র স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কাজ করে থাকে। এই সমস্ত পদ্ধতির জ্ঞান আমাদের থাকা এই জন্য প্রয়োজন যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধের সময় পূর্বেই যেনোআমরা এটা বুঝতে পারি যে, কাফিররা সমস্যা সমাধানের যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে দ্বন্দ্বের মিমাংশায় পৌছার চেষ্টা করতে পারে এবং অনেক ব্যাপার যা কোনো এক পর্যায়ে তর্কের উর্ধে ও বোধ শক্তির বাহিরে মনে হতো তা প্রয়োজনের খাতিরেতর্কবিতর্ক, সংলাপ এবং আদান প্রদানের মাধ্যমেআপোষ মিমাংশায় প্রস্তুত হতে পারে।কিন্তু মুসলিমদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলমানরা স্বীয় আভ্যন্তরীণদ্বন্দ্বসমূহ অথবা কাফিরদের সাথে নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য স্বীয় মতামত, কিংবা স্বীয় অভিলাষ অথবা স্বার্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না বরং তাদেরকে শরীয়তের দিকে দৃষ্টিপাত করতেহয়। অতপর শরীয়তই সমাধান দিবে যে, কে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর কে অসত্যের ওপর? এবং কোথায় যুদ্ধ করা আবশ্যক আর কোথায় চুক্তি করার প্রয়োজন? কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধি-পরামর্শ চলবে আর কোন ক্ষেত্রে তা চলবে না? উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নিতকরা এবং কুফরের অবসান ঘটানো এটা এমন একটা বিষয় যাতে কোনো ধরনের আদান প্রদান চলবে না আর না তাতে কোনো প্রকারের মধ্য পন্থা অবলম্বন করা যাবে। কাফিরদেরকে হয়তো বা ইসলাম গ্রহন করতে হবে কিংবা টেক্স প্রদান করে ছোট্ট হয়ে থাকতে হবে অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।এর বিপরীত মুসলিম বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে শরীয়তের আহ্কাম অনেকটা নমনীয় ও প্রসস্ত। বিদ্রোহীরা যদি আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যাবেনা। বিদ্রোহ চলা কালে যে সমস্ত কাজকর্ম তাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে তাতেওতাদের প্রতি কোনো আপত্তি করা যাবেনা।মোট কথা একজন মুসলিমকে স্বীয় সমস্যার সমাধানে একমাত্র শরীয়তের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।শরীয়ত যেভাবে তাকে আদেশ দিবে ঠিক সেইভাবেই সেসমাধান করবে, চাহে এ সমাধান তার নিজেরপার্থিব স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকরই হোক না কেনো।

❖ যুদ্ধের সরঞ্জাম

পরিচিতি

যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য যুদ্ধের উচ্চতর উদ্দেশ্য লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা বিঘ্নকে দূরীভূত করা বা যুদ্ধের উচ্চতর উদ্দেশ্য লক্ষ্যের পথে প্রতিবন্ধকতাকে অপসারণ করা। যখন এক পক্ষ অন্য পক্ষের উচ্চতর উদ্দেশ্য লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তখন বিরোধ সৃষ্টি হয় বা দন্দ জন্ম নেয়। যদি এই কলহের নিস্পত্তি সময়মত না হয় তাহলে তা যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করা হয়, যুদ্ধ করার অস্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম যুদ্ধক্ষেত্রের অনুসারে তৈয়ার করা হয় এবং তা তাতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, পুরাতন কাল হতে শুধুমাত্র সশস্ত্র ক্ষেত্রেই যুদ্ধ চলে আসছে না বরং রাজনৈতিক ময়দানেও অগণিত যুদ্ধ লিপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে যুদ্ধ অর্থনৈতিক এবং দাওয়াতী ময়দানেও চলে আসছে। যদি কারোর মাথায় যুদ্ধের উদ্দেশ্য কিছু উচ্চতর লক্ষ্য উদ্দেশ্য সমূহের অর্জন হয় তা'হলে তার জন্য এই সমস্ত যুদ্ধের বিভিন্ন ময়দানকে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় আর যদি কারোর মাথায় যুদ্ধের দ্বারা শুধুমাত্র মারামারি, কাটাকাটি, হাংগামা এবং রক্তপাতই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা'হলে এ কথা হয়তো তার বুঝা আসবে না।

বস্তুতঃ পুরাতন কাল থেকেই দাওয়াতী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সশস্ত্র এই চারটি ময়দানেই যুদ্ধ চলে আসছে। এই চারটি ময়দানে যুদ্ধ করার জন্য সশস্ত্র শক্তিকে সর্বদা দাওয়াতী, আসকারী বা সশস্ত্র, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ময়দানে যুদ্ধের সরঞ্জাম এর প্রয়োজন হয়ে থাকে কেনোনা প্রত্যেক ময়দানে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজন হয় এবং তারই অনুসারে সশস্ত্র শক্তি তৈরি করা হয়। এই শক্তিকে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী সকল প্রকারের জরুরী প্রশিক্ষণ দ্বারা অলঙ্কৃত

বাসজ্জিত করা হয়। যে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী যে, যুদ্ধের সরঞ্জাম যেনো ক্ষেত্র অনুযায়ী হয় এবং সে গুলোকে পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করে তাকে বিশেষ অনুপাতে ব্যবহার করা হয়।

অতপর যুদ্ধের ময়দান যদি কোনো ভিন্ন ধরনের হয় আর যুদ্ধের সরঞ্জাম তা থেকে ভিন্ন প্রকারের হয় তা'হলে এ সরঞ্জাম দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতির সম্মূখিন হতে হবে। সশস্ত্র শক্তির প্রত্যেক সরঞ্জাম বা হাতিয়ার স্বীয় যুদ্ধের ময়দান অনুযায়ী যুদ্ধ করার সুশৃঙ্খল দক্ষতাসমূহ অর্থাৎ পদক্ষেপ (আকদাম/ হামলা) এবং প্রতিরক্ষা (দিফা'আ) এর দ্বারা পস্তুত থাকা উচিত। এ দু'টি দক্ষতা (আকদাম বা আক্রমণ এবং দিফা'আ বা প্রতিহত করার অথবা আত্মরক্ষার ক্ষমতা) অর্জনের জন্য যুদ্ধের সরঞ্জামে তিনটি মৌলিক সশস্ত্র ক্ষমতাসমূহ অর্থাৎ আঘাত হানা, অবস্থান পরিবর্তন করা এবং প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করার জন্য যথাযোগ্য অস্ত্রসশস্ত্রেরও নির্ধারণ করা হয়। যুদ্ধের ক্ষেত্র অনুযায়ী যুদ্ধে প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধের ক্ষেত্র অনুযায়ী অস্ত্রসশস্ত্রের উপস্থিতি এই দু'টির সমন্নয়ে কোনো আসকারী বা সশস্ত্র শক্তির মধ্যে আঘাত হানার, অবস্থান পরিবর্তন করার এবং প্রতিরক্ষার দক্ষতা সৃষ্টি করে। নিম্নে প্রত্যেক যুদ্ধের ময়দান অনুসারে যুদ্ধে ব্যবহত যুদ্ধের মৌলিক সরঞ্জামকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হলো।

(১) যুদ্ধের রাজনৈতিক সরঞ্জাম (২) যুদ্ধের অর্থনৈতিক সরঞ্জাম (৩) যুদ্ধের দাওয়াতী সরঞ্জাম(৪) যুদ্ধের আসকারী সরঞ্জাম

যুদ্ধের সরঞ্জাম এর বুনিয়াদী প্রকারভেদ তো উপরোল্লেখিত চারটিই কিন্তু এগুলোর প্রস্তুতিতে এবং নির্ণয়ে আরো কিছু সহায়তাকারী উপাদান এর প্রতি লক্ষ্য রাখাও আবশ্যক। উদাহরণ সরূপ বলা যেতে পারে যে, যখন দুই পক্ষের মাঝে এমন একটি বিরোধ বা দ্বন্দ্ব শুরু হয় যা যুদ্ধের কারণে পরিণত হতে পারতো কিন্তু তা এখনো যুদ্ধে পরিণত হয়নি তখন উচ্চতর উদ্দেশ্য লক্ষ্য হাসিল করার জন্য নিম্নবর্তী তিনটি

উপায় ও উপকরণ অবলম্বন করা যেতে পারে। এই উপায় ও উপকরণকে যুদ্ধের পদ্ধতি বা নিয়মাবলি বলা যেতে পারে।

(১) ত্রাস বা আতঙ্ক সৃষ্টিকারী যুদ্ধ (War of awe)

(২) নিরাপত্তা বহনকারী যুদ্ধ (War of pre-empt)

(৩) সমযোগ্যতা সম্পূর্ণ বিশিষ্ট যুদ্ধ (War of equality)

(১) ত্রাস বা আতঙ্ক সৃষ্টিকারী যুদ্ধ (War of awe)

ত্রাস সৃষ্টিকারী অর্থাৎ ভীতসন্ত্রস্তকারী বা আতঙ্ক সৃষ্টিকারী যুদ্ধের অর্থ হলো এই যে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রুপান্তরিত হওয়ার আগেই যুদ্ধের প্রস্তুতির ব্যাপারে এমন কিছু পদক্ষেপ নেয়া যার দ্বারা শত্রুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধ স্থকিত করতে বাদ্য হয়।

(২) নিরাপত্তা বহনকারী যুদ্ধ (War of pre-empt)

শত্রুদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ না দিয়ে তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করা এর মাধ্যমে শত্রুদের অমনোযোগিতা হতে উপকৃত হয়ে তাদেরকে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখিন করা যাতে তাদের যুদ্ধে ইচ্ছা শেষ হয়ে যায়। একেই নিরাপত্তাবহনকারী যুদ্ধ বলা হয়।

(৩) সমযোগ্যতা সম্পূর্ণ বিশিষ্ট যুদ্ধ (War of equality)

যুদ্ধের সূচনাতেই যদি শত্রুপক্ষ সচেতন হয়ে তারা সমস্ত শক্তি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করে এবং লড়াই করতে বাধ্য করে তাহলে এই ধরনের যুদ্ধকে সমবাদী যুদ্ধ বা (War of equality)বলা হয়।

উপরোক্ত এই তিনটি পদ্ধতির যুদ্ধে ভিন্ন ধরনের যুদ্ধের সরঞ্জাম ব্যবহার হয়ে থাকে। অতএব যে কোনো যুদ্ধের জন্য তার উপাদানকে সামনে রেখে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করা এবং তার নির্বাচন করা প্রয়োজন।

যখন কোনো যুদ্ধের ফিল্ডে যুদ্ধ করা হয় তখন যুদ্ধ কার্যকর হওয়ার দিক দিয়ে যুদ্ধে নিম্নলিখিত দুইটি মৌলিক কার্যতৎপরতা সংঘটিত হয়।

(১) আক্বদাম বা পদক্ষেপ।

(২) দিফা'আ বা আত্মরক্ষা।

(১) আক্বদাম বা পদক্ষেপ।

শত্রুদেরকে পরাজিত করার জন্য অথবা তাদের মধ্যে বিপর্যয় বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য যে পদক্ষেপ নেয়া হয় তাকে আক্বদাম বা পদক্ষেপ বলা হয়।

❖ *(২) দিফা'আ বা আত্মরক্ষা।*

শত্রুদের হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় তাকে দিফাহ বা প্রতিরক্ষা বলা হয়। অতএব প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রের সরঞ্জামে পদক্ষেপ এবং প্রতিরক্ষার এই দু'টি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। এই সরঞ্জামকে (পদক্ষেপ এবং প্রতিরক্ষাকে) সেই সকল প্রয়োজনীয় মৌলিক দক্ষতার সাথে প্রস্তুত করা এবং সেই সরঞ্জামের (পদক্ষেপ এবং প্রতিরক্ষা) সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ দেয়াকে যুদ্ধের প্রস্তুতি বলা হয়। এছাড়া যুদ্ধের সরঞ্জাম সম্পর্কে প্রস্তুতি এবং তার নির্বাচনে যুদ্ধের উদ্দেশ্য লক্ষও দৃষ্টি রাখতে হবে।

অতপর যুদ্ধের সরঞ্জাম সম্পর্কে প্রস্তুতি এবং তার নির্বাচনে নিম্নবর্তী চারটি উপকরণের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে।

(১) মাকসাদে জং বা যুদ্ধের উদ্দেশ্য লক্ষের প্রতি।

(২) যুদ্ধের প্রদ্ধতির প্রতি [ত্রাস, নিরাপত্তা এবং সমযোগ্যতা যুদ্ধের প্রতি]।

(৩) যুদ্ধের ময়দানের প্রতি [দাওয়াতী দিক, রাজনৈতিদিক, অর্থনৈতিক দিক এবং যুদ্ধের আসকারী দিক]

(৪) যুদ্ধের তৎপরতার প্রতি [পদক্ষেপ ও আত্মরক্ষা]

যুদ্ধের সরঞ্জামের সাথে এই চারটি উপকরণের কি সম্পর্ক তার বিস্তারিত অলোচনা নিম্নে পদত্ত হলো।

(১) যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং মাকসাদে জং বা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

যুদ্ধের সরঞ্জাম সম্পর্কিত প্রস্তুতি এবং সরঞ্জামের নির্বাচনের প্রতি যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ সরাসরি প্রভাবিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যদি মুজাহিদীনদের জিহাদ মুসলিম জণগনের ওপর চেপে বসা মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে হয় অথবা কোনো একটি অত্যাচারী শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার নিমিত্তে হয় তাহলে আসকারী আলাত বা সশস্ত্র শক্তির চেয়ে বেশি রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার করতে হবে।

যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ হতে এই কথা নির্ধারিত হয় যে, কোন ময়দানের যুদ্ধকে অথবা কোন যুদ্ধের সরঞ্জামকে কতটুকু গুরুত্ব দিতে হবে এবং কোন সরঞ্জামের জন্য আত্মরক্ষা ও কোনটির জন্য পদক্ষেপ নেয়ার কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে। এরই ভিত্তিতে যুদ্ধ চলা কালে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা নেয়া হয়। যুদ্ধের উদ্দেশ ও লক্ষ, যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং যুদ্ধের কর্মপন্থা (পদক্ষেপ ও প্রতিরক্ষা) এর নির্ধারণের পর প্রত্যেক যুদ্ধ ক্ষেত্র অনুযায়ী যুদ্ধের ময়দানের সরঞ্জামের[১] নির্বাচন একটি জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যা যুদ্ধের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাজ। এ ব্যাপারে এটা দেখা হয় যে, কোন পদ্ধতিকে, কোন সম্পদকে অথবা কোন অস্ত্রসশস্ত্র ও কোন সরঞ্জামকে পদক্ষেপ এবং প্রতিরক্ষা অথবা আঘাত, সামরিক তৎপরতা এবং আত্মরক্ষার মৌলিক দক্ষতার দ্বারা সজ্জিত করা যায়।

---

[১] 'আলাতে ময়দান বা যুদ্ধের ময়দানের সাজ-সরঞ্জাম' 'আলাতে হরব বা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম' এর মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। যুদ্ধের সরঞ্জাম হলো চারটি যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি অর্থাৎ যুদ্ধের রাজনৈতিক সরঞ্জাম, যুদ্ধের অর্থনৈতিক সরঞ্জাম, যুদ্ধের দাওয়াতী সরঞ্জাম এবং যুদ্ধের আসকারী সরঞ্জাম কিন্তু উল্লেখিত প্রত্যেকটি সরঞ্জামের অধিনে যুদ্ধের ময়দানের কিছু প্রত্যক্ষ সরঞ্জাম ব্যবহার হয় যেমন আসকারী সরঞ্জামের অধিনে যুদ্ধ চলা কালে ক্লাশন, পিকা, রকেট ব্যবহার হয় এ সব যুদ্ধের ময়দানের সরঞ্জাম। এমনিভাবে যুদ্ধের দাওয়াতী সরঞ্জামের অধিনে যে সমস্ত সিডি, ওয়েব সাইট, কেসেট ও হেন্ডবিল ব্যবহার হয় এ সবই যুদ্ধের দাওয়াতী সরঞ্জামের অন্তর্ভূক্ত।

(২) যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং যুদ্ধের পদ্ধতির [ত্রাস, নিরাপত্তা এবং সমযোগ্যতার দিক দিয়ে]।

যুদ্ধের সরঞ্জামের নির্বাচনে যুদ্ধের পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। ত্রাস সৃষ্টিকারীর [War of awe] নীতিমালাতে সেই সকল যুদ্ধের সরঞ্জাম ব্যবহার হতে পারে যাতে এমন ক্ষমতা থাকা দরকার যে, শত্রু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেনো স্বীয় যুদ্ধের ইচ্ছা ছেড়ে দেয়। এমনিভাবে শত্রুদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করার আগেই আক্রমণের যে পদ্ধতি [pre emption] প্রচলিত রয়েছে তাতে সেই যুদ্ধের সরঞ্জাম ব্যবহার হবে যাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার দক্ষতা আছে। পক্ষান্তরে যুদ্ধের সমবাদী পদ্ধতিতে [War of equality] যুদ্ধের সেই সমস্ত সরঞ্জাম সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার হবে যাতে তারা পদক্ষেপ ও প্রতিরক্ষা উভয়ের প্রতি দক্ষ হয়।

নিম্নে যুদ্ধের সরঞ্জামের নির্বাচনের প্রতি তিন প্রকারের যুদ্ধের পদ্ধতির প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হলো।

(১) যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং ত্রাস বা আতঙ্ক সৃষ্টিকারী যুদ্ধ (War of awe)

শত্রুদের লড়াই করার ইচ্ছাকে নস্যাৎ করার জন্য উভয় পক্ষ এটাই চায় যে, প্রতিপক্ষ লড়াই করা ছাড়াই যুদ্ধ হতে বিরত থাকুক এবং আমাদের কথা মানতে বাধ্য হোক। কিন্তু এটা কেমন করে সম্ভব? এটা শুধুমাত্র এই ভাবে সম্ভব যে, কোনো একপক্ষের মধ্যে প্রতিপক্ষকে এটা বুঝানোর দক্ষতা বিদ্যমান থাকতে হবে যে, এই যুদ্ধে যা কিছু তুমি অর্জন করতে চাচ্ছো তার চেয়ে বেশি তোমাকে ক্ষতির সম্মুখিন হতে হবে। শত্রুদেরকে বুঝানোর এই দক্ষতাকে ত্রাস সৃষ্টির ক্ষমতা বলে আখ্যায়ীত করা হয়। ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য সাধারণতঃ আলাপ আলোচনা এবং রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক ময়দান ব্যবহার করে কাজ নেয়া হয়। এরই মাধ্যমে

শত্রুদেরকে স্বীয় সমর্থক হতে পৃথক করা হয় যা শত্রুদের জন্য রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণ হয়ে দাড়ায়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো এই যে, সমাজে শত্রুদের সামাজিক সমর্থক নস্যাৎ করা হয়। এতে শত্রুদের উচ্চতর উদ্দেশ ও লক্ষ্য এবং চারিত্রীক দিককে মিথ্যা পতিপন্ন করা হয়। তৃতীয় স্তর হলো এই যে, শত্রুদের প্রতি এমন অর্থনৈতিক নিষেদাজ্ঞা অর্পন করা হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আমদানী ও রফতানীর ওপর প্রভাব পড়ে। চতুর্থ দাপে শত্রুদেরকে এমন সব আসকারী শক্তির মাধ্যমে অথবা এমন সব অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ভয় প্রদর্শন করা হয় যার মাধ্যমে তাদের অনেক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। অতএব ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্র, অর্থনৈতিক ময়দান এবং সশস্ত্র সরঞ্জাম অর্থাৎ আসকারী শক্তি এমন ভাবে ব্যবহার করা হয় যা শত্রুদেরকে যুদ্ধের মাঠে অবতণের পূর্বেই পরাজয় বরণের ভয়ে ভীত করে তুলে।

(২) যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং অগ্রনিরাপত্তাবাহী যুদ্ধ (War of pre-emption)

যদি ত্রাস সৃষ্টি করার দক্ষতা কাজে না আসে তাহলে সশস্ত্র সরঞ্জাম অর্থাৎ আসকারী শক্তিতে এমন ক্ষমতা থাকা উচিৎ যে,সশস্ত্র শক্তি যুদ্ধের মাঠে অবতরণ করে প্রথমেই হামলা করে বসবে অথবা এমন কৌশল অবলম্বন করবে যাতে শত্রুপক্ষ স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জন করা হতে বিরত হয়। এই অবস্থাকে অগ্রনিরাপত্তাবাহী যুদ্ধ (Warof pre-emption)বলে। এমতাবস্থায় যুদ্ধের সরঞ্জামকে পদক্ষেপ নেয়ার ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবহার করা হয়।

(৩) যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং সমবাদী যুদ্ধ (War of equality)

যদি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূবেই শত্রুপক্ষও যুদ্ধর জন্য প্রস্তুত হয় এবং যুদ্ধের সূচনাতেই লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলে একে সমবাদী যুদ্ধ (War of equality) বলা হয়। এমতাবস্থায় যুদ্ধ দীর্ঘ আকার ধারন করতে পারে। বিধায় যুদ্ধের সরঞ্জামকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য যথার্থ হয়। এই যুদ্ধে প্রায় সব ধরনের যুদ্ধের সরঞ্জাম ব্যবহার হয়ে থাকে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন সরঞ্জামকে পদক্ষেপ ও প্রতিরক্ষার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়।

❖ *যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং যুদ্ধের ময়দান*

যুদ্ধের সরঞ্জামকে সংগঠিত করা এবং একে শ্রেনীবিন্যাসে সজ্জিত করার প্রতি যুদ্ধ ক্ষেত্রের ধরন প্রভাবিত হয়। যুদ্ধের সকল প্রকারের সরঞ্জাম নিজ নিজ সম্পর্কিত যুদ্ধ ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়ে থাকে। বিধায় যুদ্ধের সরঞ্জাম যুদ্ধের ময়দান অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। যুদ্ধ চলা কালে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে প্রত্যেক যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যেক ময়দানে শত্রুদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধাদেরকে) সংঘটিত করা হয়। প্রত্যেক ময়দানে (যুদ্ধাদেরকে) সংঘটিত করার মধ্যে পদক্ষেপ (হামলা করার দক্ষতা) এবং প্রতিহত (আত্মরক্ষার দক্ষতা) উভয় প্রকার দক্ষতা থাকা আবশ্যক। কেনোনা এক যুদ্ধ ক্ষেত্রের সরঞ্জাম অন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে পারে না যদিও এগুলো একে অপরের সহায়ক হতে পারে।

নিম্নে যুদ্ধের সরঞ্জামের নির্বাচনে চার প্রকারের যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রভাব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো।

(১) যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং দাওয়াতী ময়দান

যুদ্ধে সকল পক্ষ স্বীয় উচ্চতর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিল করার জন্য জনগণের সমর্থন অর্জনের নিমিত্তে দাওয়াতী ময়দানে কাজ করে থাকে। সকল আসকারী শক্তি বা সশস্ত্র শক্তিরা দাওয়াতী ময়দানে দাওয়াতী কাজ সংগঠিত করার জন্য দাওয়াতী শাখা কায়েম করে যার উদ্দেশ্য এই ময়দানে লড়াই করা হয়ে থাকে। যুদ্ধ চলা কালে এই

শাখাই সবচেয়ে গুরুত্ববহ শাখা হিসাবে পরিগণিত হয়। এই শাখা একদিকে অন্যান্য শাখাগুলোর সাহায্য করে অপরদিকে রাজনৈতিক শাখার সাথে জড়িত হয়ে যুদ্ধের অনেক উদ্দেশ ও লক্ষকে সম্পাদন করে। যেহেতু এই শাখার কাজ সমাজে সম্পাদিত হয়ে থাকে বিধায় সমাজ হতে অর্জিত বেশিভাগ অর্থ এ শাখার মাধ্যমেই হাসিল হয়।

এ শাখার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ লাভজনক দিক নিম্নে পদত্ত হলোঃ

(১) জনশক্তির প্রদান।

(২) অর্থ-সম্পদের সঞ্চয়।

(৩) রাজনৈতিক ও দাওয়াতী শাখাসমূহের সাহায্য।

(৪) যুদ্ধের পক্ষে অথবা যুদ্ধের বিপক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করা।

(৫) গোরিলা যুদ্ধে গরিলাদের আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা।

এই শাখা অথবা এই ময়দানের ভিতরগত সরঞ্জাম ভিন্নতর হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ, বিবৃতি, বক্তিতা, আলোচনা সভা, তর্কবিতর্কের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা, গ্রন্থ লিখা ও তা পাবলিশ করা, হেন্ডবিল বিতরণ করা, পুস্তক প্রনয়ণ, ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ফ্লিম এবং ভিডিও বিবৃতি ইত্যাদি এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। দাওয়াতী ময়দানে সফলতা অর্জন যুদ্ধের বিজয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তাতার আসকারী ময়দানে বিজয় হওয়া সত্যেও দাওয়াতী ময়দানে পরাভূত হয়ে মসলমান হয়। অনুরূপ দাওয়াতের প্রসারতাই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়ে ছিলো।

(২) যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং রাজনৈতিক ময়দান।

রাজনৈতিক ময়দানে কর্মরত কর্মীবাহিনী আসকারী শক্তির রাজনৈতিক শাখা বলা হয়। রাজনৈতিক ও দাওয়াতী শাখার কাজের মধ্যে কোনো মৌলিক প্রার্থক্য নেই। রাজনৈতিক শাখা দাওয়াতকে রাজনৈতিকভাবে উপস্থাপন করারই নামান্তর মাত্র। কিন্তু রাজনৈতিক শাখার কাজের ধরন দাওয়াতী কাজের তুলনায় অত্যন্ত তীব্র হয়ে থাকে। এছাড়া রাজনৈতিক শাখা দাওয়াতী কাজকে ফলপ্রসু করে তুলা এবং তার দ্বারা উচ্চতর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম করা হয়। রাজনৈতিক শাখার উদ্দেশ্য হলো এই যে, স্বীয় শত্রুর সংখ্যা কম করা, সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং সমর্থকদেরকে রাজনৈতিকভাবে কর্মসূচীতে একত্রিত করা। কোনো কোনো সময় রাজনৈতিক শাখা একাই শত্রুদের যুদ্ধের ইচ্ছাকে নস্যাৎ করে ফেলে। ইতিহাসের পাতায় অনেক সময় এরূপ হয়েছে যে, কোনো শত্রু অন্যের ওপর আক্রমণ করে বসেছে তখন রাজনৈতিক শাখা অন্য কোনো শক্তিকে নিজের সাথে জড়িত করে নেয় যার পরিপ্রেক্ষিতে শত্রুদের লড়াই করা সাহস শেষ হয়ে গেছে। অথবা এমনও হয়েছে যে রাজনৈতিক শাখা শত্রুদের কোনো মিত্রকে তাদের থেকে পৃথক করতে সফল হয়েছে পরিপ্রেক্ষিতে শত্রুদের লড়াইয়ের সাহস নস্যাৎ হয়ে পড়েছে। এর উদাহরণ হলো এই যে, খন্দকের যুদ্ধে ইহুদী ও মুশরিকদের সেনাবাহিনীর মাঝে ফাটল সৃষ্টিতে সফলতা অর্জন। অনুরূপ শস্যের কিয়দংশ দিয়ে ‘গাতফান’ গোত্রকে পৃথক করার চেষ্টা। এমনিভাবে আবু তালেবের ব্যক্তিত্ব নবী (সঃ) এর জন্য রাজনৈতিক প্রতিরক্ষার কাজ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত সা’আদ বিন ময়াজ (রাঃ) কে ইসলামের দিকে ধাবিত করার চেষ্টাতেও একটি রাজনৈতিক দিক জড়িত ছিলো কেনোনা তার ইসলাম গ্রহন তার গোত্রের লোকদের ইসলাম কবুল করার সহায়ক হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো এবং প্রত্যক্ষভাবে পরে তাই হয়েছে।

(৩)যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং অর্থনৈতিক ময়দান

পুরাতন কাল হতেই যুদ্ধরত প্রত্যেক দল নিজেদের অর্থনৈকিত ব্যবস্থাকে নিরাপদ এবং শত্রুদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করাকে অগ্রগণ্য বিষয় মনে করতো। আধুনিক যোগেও যুদ্ধের অর্থনৈতিক শাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন বলে অভিহিত করা হয়। পাশ্চাত্যরা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সহ অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করে এই শাখাকে প্রত্যেক্ষভাবে একটি সশস্ত্র হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। অর্থনৈতিক হাতিয়ারকে নিম্নবর্তী পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়।

- কোম্পানীসমূহকে শত্রুদের নিকট প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রপ্তানী করকে নিষেধ করা হয়।
- ব্যাংকসমূহকে অর্থ প্রদান করা হতে বিরত রাখা হয়।
- মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়।
- স্বীয় মিত্রদেশের মুদ্রাকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে শক্তিশালী করা হয়।
- দেশের সকল পথ তথা স্থলপথ, জলপথ (সামুদ্রিক পথ) এবং আকাশ পথের (বিমান পথের) মাধ্যমে দ্রব্যাদি আমদানি করা হতে বিরত রাখা হয়।
- এমনিভাবে জলপথ, স্থলপথ এবং আকাশ পথের মাধ্যমে রপ্তানীর ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

মক্কার কাফিরদের পক্ষ হতে নবী (সঃ) কে শা'আবে আবি তালেবে কারারুদ্ধ এবং সামাজিক বয়কট একটি অর্থনৈতিক হামলা ছিলো। ইরাকের প্রতি আমেরিকার অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাও এরই উদাহরণ। ইসরাঈলের পক্ষ হতে ফিলিস্তীনে গাজার মুসলমানদের প্রতি অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, বোসনিয়ার ওপর সার্বিয়ার আক্রমণের সময় বোসনিয়ার মুসলিমদের নিকট অস্ত্র পৌছানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং আফগানিস্তানের ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করার আমেরিকার প্রচেষ্টা এ সবই অথনৈতিক হামলারই অন্তভূক্তের উদাহরণ বই আর কিছু নয়।

(৪)যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং আসকারী ময়দান

যুদ্ধের আসকারী বিভাগ যারা শত্রুদের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই বিভাগের উদ্দেশ্য হলো এই যে, শত্রুদের এলাকা দখল করে নেয়া অথবা শত্রুদের এমন ক্ষতি সাধন করা যার কারণে তারা স্বীয় যুদ্ধের ইচ্ছাই বর্জন করতে বাধ্য হয়। এই কাজের জন্য আসকারী বিভাগকে এমন দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে যে, যার দ্বারা শত্রুদের সশস্ত্র সারিতে প্রবেশ করতে পারে এবং শত্রুদের হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। পুরাতন কাল হতে আধুনিক যোগ পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীদের শ্রেনীবিন্যাস দুইভাগে বিভক্ত হয়ে আসছে। এক অংশ যুদ্ধরত হয় এবং দ্বিতীয় অংশ তাদের সাহায্যকারী হিসাবে উপস্থিত থাকে। যুদ্ধরতবাহিনী পদাতিক, অশ্বআরোহী এবং গোলন্দাজ বাহিনী দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে। আধুনিক কালে পদাতিক বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়। বক্তারবন্ধ পদাতিক দল অন্যটি শুধু পদাতিক দল এদের কাজ হলো ভুমি দখল করা এবং দখলকৃত এলাকায় আয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। আধুনিক যোগে অশ্বআরোহীর স্থান নিয়েছে ট্যাঙ্ক। অশ্বআরোহী বা টেংক পরিচালক সৈন্যদলের কাজ শত্রুদের ভিতর প্রবেশ এবং পদাতিক বাহিনীর সাহায্য করা। গোলন্দাজ বাহিনীর কাজ শত্রুদের ওপর বোমা বর্ষণ করে তাদের সেই পরিমাণ ক্ষতিসাধন করা যাতে পদাতিক বাহিনী ও টেংক পরিচালকরা শত্রুদের ভিতর ঢুকতে পারে। যুদ্ধে সাহায্য প্রদানকারী বিভাগসমূহের মধ্যে যে, বিভাগ রসদ সরবরাহকারীর দায়িত্ব পালন করে থাকে তাদের কাজ হলো লড়াইরত সেনাবাহিনী নিকট খাদ্যসামগ্রী এবং অশস্ত্র সশস্ত্র পৌছানো। যুদ্ধে যোগাযোগ রক্ষণাবেক্ষণকারী বিভাগের কাজ হলো লড়াইরত সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষদের সাথে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ স্থীতিশীল করা। যুদ্ধে গোয়েন্দা বিভাগের কাজ হলো শত্রুদের স্থানান্তরিত হওয়ার প্রতি ও তাদের কর্মকৌশলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং তা থেকে সচেতন রাখা। যুদ্ধে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের উদ্দেশ্য রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা পক্ষান্তরে মেডিকেল বিভাগের কাজ আহতদের চিকিৎসা ও তাদের সেবা করা। যুদ্ধের আসকারী সরঞ্জামের ব্যবহার যুদ্ধের পদ্ধতি এবং কর্মপন্থা অনুযায়ী করা হয়।

যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং যুদ্ধের কর্মতৎপরতাসমূহ

যখন কোনো যুদ্ধের সূচনা হয় তখন তাতে দুইটি মৌলিক তৎপরতা স্থায়ীভাবে বলবৎ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো একপক্ষ তার উচ্চতর উদ্দেশ ও লক্ষ্য অর্জন করতে সফল না হয়। যুদ্ধের এই দু'টি তৎপরতা নিম্নে পদত্ত হলোঃ

- **আকদাম বা পদক্ষেপ**
- **দিফা'আ বা আত্মরক্ষা**

সর্বপ্রকারের যুদ্ধের সরঞ্জামে এই দু'ধরনের দক্ষতা থাকা দরকার। এই দুই দক্ষতা ছাড়া কোনো যুদ্ধের সরঞ্জামকে যুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে না। অনুরূপ যুদ্ধের ময়দানের সরঞ্জামের নির্বাচনও এমন ভাবে করা হয় যে, যুদ্ধের প্রত্যেক সরঞ্জাম আত্মরক্ষা ও পদক্ষেপের মতো দক্ষতার দ্বারা জড়িত হয়।

তানযিমে হরব বা সংগঠিত যুদ্ধ পরিচিতি

প্রথম খন্ডে আমরা যুদ্ধকে বোঝার চেষ্টা করেছি। যুদ্ধকে বোঝার পর এ কথা খুব অনায়াসেই বোঝে আসে যে, বিরোধ বা দ্বন্দ্বের আকারে উচ্চতর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য এমন একটি দল সংগঠিত করার প্রয়োজন যারা যুদ্ধের সকল দিককে সম্মুখে রেখে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে যেনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। এই সকল উদ্দেশ্য সমূহকে হাসিল করার জন্য যে শক্তি প্রস্তুত করা হয় তাকে আসকারী শক্তি বা সশস্ত্র শক্তি বলা হয়। এই সশস্ত্র শক্তির প্রস্তুতির কাজ এবং প্রস্তুত হওয়া আসকারী শক্তির যুদ্ধকে সংগঠিত করার আমলই তানযিমে হরব বা সংগঠিত যুদ্ধ হিসাবে আখ্যায়ীত।সংগঠিত যুদ্ধের তিনটি দিক রয়েছে যা নিম্নে পদত্ত হলোঃ

- আসকারী শক্তি বা সশস্ত্র শক্তির গঠন।
- শক্তি প্রয়োগ।
- সামরিক অভিযান

যুদ্ধ বিন্যাস

- **Military force** বা সশস্ত্র শক্তি।
- **Application of force** বা শক্তি প্রয়োগ।
- **Conduct of military operation** বা সামরিক অভিযান।

আসকারী বা সশস্ত্র শক্তির পরিচয়

আমরা এই বইয়ের প্রথম খন্ডে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে পড়ে আসছি যে, দুই দল বা পক্ষের মাঝে মতবিরোধ বা দ্বন্দ্বের কারণে যুদ্ধের সূচনা হয়ে থাকে। যখন এই বিরোধের মীমাংসা উভয়ের মাঝে না হয় তখন এই পরিস্থিতি কতিপয় অবস্থার পর যুদ্ধের আকার ধারণ করে। যুদ্ধ দুই ব্যক্তি, দুই গোত্র, দুই জাতি বা দেশ এবং দুইটি ধর্ম বা আদর্শের মাঝে হতে পারে। যখন ব্যাপকভাবে দুইটি দল যুদ্ধের করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে তখন তাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য আসকারী শক্তি সংগঠিত করতে হয়। সশস্ত্র শক্তি এমন একটি শক্তি যারা যে কোনো বিরোধী শক্তির সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। আসকারী শক্তির সঠিক সংজ্ঞা এরূপ হতে পারে যে, মানুষের এমন একটি দল যাদেরকে স্বীয় উচ্চতর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যুদ্ধের বিষয়বস্তু অনুযায়ী সংগঠিত করা হয় এবং যারা পদক্ষেপ (আক্রমণ) ও দিফা'আ বা প্রতিহত করার উভয় ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয় এমন দলকে সশস্ত্র শক্তি বা আসকারী শক্তি বলে আখ্যায়ীত করা হয়। আসকারী শক্তিকে বিস্তারিতভাবে বোঝার জন্য নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়বস্তুকে বোঝা উত্তম।

- **আসকারী শক্তির মৌলিক দক্ষতা।**
- **আসকারী শক্তির পরিমাপ।**
- **আসকারী শক্তির প্রকারভেদ।**

❖ আসকারী শক্তির মৌলিক দক্ষতা।

আসকারী শক্তির মাঝে যুদ্ধ করার তিন ধরণের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।প্রথমতঃ আক্রমণ বা আঘাত করার যোগ্যতা। দ্বিতীয়তঃ অবস্থান পরিবর্তন করার যোগ্যতা। তৃতীয়তঃ আত্মরক্ষার যোগ্যতা। এই তিনটি যোগ্যতা ছাড়া কোনো আসকারী শক্তি সংগঠিত হতে পারে না। অথবা এ ধরণের যোগ্যতা ছাড়া যদি আসকারী শক্তি সংগঠিত করা হয় তাহলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পারবে না। এই তিনটি যোগ্যতার সাহায্যে যে কোনো আসকারী শক্তি যুদ্ধকালে পদক্ষেপ

এবং প্রতিরক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করে থাকে। নিম্নে আসকারী শক্তির এই তিনটি যোগ্যতা এবং তার ব্যবহার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো।

(১)আক্রমণ বা আঘাত করার যোগ্যতা।

শত্রুদের প্রতি আক্রমণ করার দক্ষতাকে 'আঘাত হানার' যোগ্যতা বলা হয়। আঘাত হানার ক্ষমতা সেই যোগ্যতাকে বলা হয় যে, লড়াইরত দল পরস্পর একে অপরের ক্ষতিসাধন করে তাদের সারিতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। অতীত কাল হতেই আঘাত হানার যোগ্যতা যুদ্ধশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে আখ্যায়ীত। অতীতে আঘাত হানার জন্য তীর ও তলোয়ার, বল্লম এবং মিন্‌জানিক ব্যবহার হতো এবং পরে বারুদের ব্যবহার প্রচলিত হয়। সাম্প্রতিকালে পিস্তল, গ্রেনেড, বন্দুক, কামান এবং জেটবিমান সবই আঘাত হানার অন্তর্ভূক্ত। অতীত কাল হোক কিংবা বর্তমান কাল আঘাত হানার যোগ্যতা ও তার ব্যবহারের আসকারী নিয়ম-নীতি একই ধরনের বলবৎ রয়েছে। আঘাত হানার যোগ্যতা ও তার ব্যবহারের আসকারী নিয়ম-নীতি দুই প্রকারের। প্রথমতঃ আঘাত হানার যোগ্যতাকে শত্রুদের সারিতে ক্ষতিসাধন করার জন্য ব্যবহার করা হয় অথবা শত্রুদেরকে নিজেদের থেকে দূর রাখার জন্য আঘাত হানার যোগ্যতাকে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়তঃ আসকারী নিয়ম-নীতি হলো এই যে, যুদ্ধরত দলের চেষ্টা হয়ে থাকে যে, কিভাবে শত্রুদেরকে প্রচন্ড আঘাত করা যায় এবং এর জন্য তারা এমন অস্ত্র ব্যবহার করে যা শত্রুদের সারিতে অবতরণ করে বেশি বেশি আঘাত করতে সক্ষম হয়। এই দুইটি নীতিকে সামনে রেখে কামান, টেংক, বিমান এবং মিজাইল ব্যবহার করা হয়।

মোট কথা হলো এই যে, সব হাতিয়ারই আসকারী শক্তিকে আঘাত হানার যোগ্যতা প্রদান করে। কিন্তু কিছু অস্ত্রসশস্ত্র এমন রয়েছে যা আঘাত হানার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী এবং যার ব্যবহার শত্রুদেরকে পিছনের দিকে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করে। এমন হাতিয়ারকে বিশেষভাবে আঘাত হানার যোগ্য হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করা হয়। এমনিভাবে শত্রুদের ওপর প্রচন্ড হামলার যোগ্যতাও আঘাত হানার ক্ষমতায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই যে, আঘাত হানার দক্ষতা

কতটুকু রয়েছে? হয়তো কোনো আসকারী শক্তির আঘাত হানার দক্ষতা পরিমাণে নিম্নপর্যায়ের হতে পারে তারপরও তার নিকট শত্রুদের আভ্যন্তরে ঢুকে আঘাত হানার যথেষ্ট যোগ্যতা থাকতে পারে।

(২) অবস্থান পরিবর্তন করার যোগ্যতা।

যুদ্ধের পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বীয় অবস্থার পরিবর্তন বা স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্যতাকে সালাহিয়াতে হরকত বা [abilityof the movment] অবস্থার পরিবর্তন করার দক্ষতা বলে অভিহিত করা হয়। যুদ্ধে পরিস্থিতি অনুযায়ী স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে আমরা 'যুদ্ধের মূলনীতি' অধ্যায়ে বেশ কিছু আলোচনা করে এসেছি। যখন আঘাত হানার দক্ষতা এবং অবস্থান পরিবর্তন করার যোগ্যতা উভয় মিলিত হয় তখন সশস্ত্র শক্তির মধ্যে আক্বদাম অর্থাৎ পদক্ষেপ বা আক্রমণ করার দক্ষতা সৃষ্টি হয়। আঘাত হানার যোগ্যতা শত্রুদের মাঝে যে ফাটল সৃষ্টি করে এই ফাটল হতে উপকৃত হওয়ার জন্য যদি আগে বাড়তে হয় তাহলে অবস্থান পরিবর্তন করার যোগ্যতা তাতে সাহায্য করে। এমনিভাবে যদি শক্তিশালী শত্রুদের মোকাবেলায় কোনো আসকারী শক্তির মধ্যে আঘাত হানার নিম্নতম যোগ্যতার সাথে স্থানান্তরিত হওয়ার বেশ কিছু ক্ষমতা বলবৎ থাকে তাহলে দ্রুতবেগে গতিশীলতা (অগ্রগামী ও পশ্চাৎপদ) অবলম্বন করে নিজেদেরকে শত্রুদের থেকে নিরাপদ হওয়া সম্ভব হয়। এমনিভাবে আক্বদাম বা পদক্ষেপ এবং দিফা'আ বা প্রতিরক্ষার জন্য উপরোক্ত দুইটি দক্ষতা তথা আঘাত হানার এবং স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্যতার উত্তম মিলন আবশ্যক। পুরাতন কালে দ্রুতগতিতে স্থানান্তর হওয়ার যোগ্যতার জন্য ঘোড়া, গাদা এবং খচ্চর ব্যবহার হতো। আধুনিক বিশ্ব বেশির ভাগ ইন্জিন পরিচালিত যানবাহনের ওপর নির্ভরশীল। উনিশশত শতাব্দীতে বাষ্প ইনজিন এবং পরে তেল বা পেট্রলে পরিচালিত ইনজিনের ব্যবহার স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্যতাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। সংগঠিত সেনাবাহিনীদের মাঝে চাহিদা অনুযায়ী স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য সৈন্যদেরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং

তাদেরকে তাদের কাজ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। গতিশীলতার ভিত্তিতে সামরিক বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত।

- শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরক্ষা সেনাবাহিনী
- শত্রুদের প্রতি আক্রমণকারী গতিশীল সেনাবাহিনী

গতিশীলতা অর্জনের আসকারী শক্তির ম্যাপ

গতিশীল সেনাবাহিনী -শত্রু-প্রতিরক্ষা সেনাবাহিনী

সাধারণতঃ প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের পরিমাণ এবং পরিমাপ বেশি হয়ে থাকে বিধায় প্রতিরক্ষা সরঞ্জামবাহী সেনাবাহিনীকে বেশি স্থানান্তর হওয়ার ভার দেয়া হয় না কেনোনা তাদের দায়িত্ব শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করা। অপরদিকে হালকা হাতিয়ারে সজ্জিত একটি দ্রুতগামী সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখা হয় যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে আক্রমণ হয় তাহলে তারা অতি সত্তর শত্রুদের ভিতর প্রবেশ করে হামলা করে এবং তাদেরকে পিছনের দিকে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করে। অথবা কতক সময় ভিন্নপথ অবলম্বন করে তাদের পিছনের দিক থেকে আক্রমণ করার চেষ্টা করা হয়। অনুরূপ একথাও স্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্যতার অধিনে [concept of tempo] বোঝাও প্রয়োজন।

(৩) আত্মরক্ষার যোগ্যতা।

যদি কোনো সশস্ত্র শক্তির মধ্যে শত্রুদের হামলা সহ্য করার যোগ্যতা থাকে তাহলে এই যোগ্যতাকে আত্মরক্ষার যোগ্যতা বলে অভিহিত করা হয়। যুদ্ধ চলা কালিন প্রত্যেক দল স্বীয় আঘাত হানার যোগ্যতা এবং অবস্থান পরিবর্তন করার যোগ্যতা প্রয়োগ করে বিরোধী দলের সীমানায় ঢুকতে চেষ্টা করে। এই হামলাকে প্রতিহত করা এমন একটি যোগ্যতা যা প্রত্যেক সশস্ত্র শক্তিকে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন। এই যোগ্যতাকে সশস্ত্র শক্তির আত্মরক্ষার যোগ্যতা বলা হয়। দিফা'আ বা প্রতিরক্ষার যোগ্যতাও দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠাকালে প্রতিরক্ষার যোগ্যতা। দ্বিতীয়তঃ অবস্থান পরিবর্তনের সময় অথবা পদক্ষেপ নেয়ার বা হামলার সময় নিজেদের আত্মরক্ষার যোগ্যতা। প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুরাতন কাল হতে

ক্যামুফ্লাজ, কিল্লা এবং পরিখা ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। আধুনিক যুগেও এই পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। অবশ্য এর সাথে মাটির নিচে গর্তও ব্যবহার করা হয়। স্থানান্তরিত হওয়ার সময় অথবা পদক্ষেপ নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য পুরাতনকালে বর্ম ব্যবহার করা হতো। আধুনিক যুগে এই উদ্দেশ্যে সামরিক ট্যাঙ্ক ও ধাতব আচ্ছাদন মোটরগাড়ি ব্যবহার করা হয়।

❖ আসকারী শক্তির পরিমাপ বা ওজন

ওজন দ্বারা বাহ্যিক অর্থ সেই সব বস্তুকে বোঝায় যা এক ব্যক্তি নিজে বহন করতে পারে কিন্তু আসকারী দিক দিয়ে ঐ সমস্ত জিনিষ পত্র বোঝায় যা সশস্ত্র শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে উহাকে সশস্ত্র শক্তির ওজন বলা হয়। তিনটি বস্তু সশস্ত্র শক্তির ওজনে অন্তর্ভূক্ত।

- জনশক্তি
- যোগ্যতা
- সম্পদ

যে কোনো সশস্ত্র শক্তির জনশক্তি বা কর্মীবাহিনীর সংখ্যা সেই সশস্ত্র শক্তির ওজনের মৌলিক অংশ হয়ে থাকে। যেমনিভাবে কোনো সশস্ত্র শক্তির জনশক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে তেমনিভাবে তার ওজনও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সশস্ত্র শক্তির অন্তর্ভূক্ত জনশক্তির যোগ্যতা তার ওজনকে বৃদ্ধি করে। সশস্ত্র শক্তির অন্তর্ভূক্ত জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের যোগ্যতা বাড়ানো যেতে পারে। এভাবে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অযোগ্যজনশক্তির অধিকারী সশস্ত্র শক্তির ওজনের চেয়ে একটি সংখ্যালঘু যোগ্য জনশক্তির অধিকারী সশস্ত্র শক্তির ওজন বেশি হতে পারে।

অর্থ-সম্পদও আসকারী শক্তির ওজন বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। উত্তম হাতিয়ার এবং সুযোগ সুবিধার অধিকারী সশস্ত্র শক্তির ওজন কম সম্পদের অধিকারী সশস্ত্র শক্তির চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

ওজন যে কোনো সশস্ত্র শক্তির ওপর দু'ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যে সশস্ত্র শক্তির ওজন বেশি হয় তার আঘাত এবং আত্মরক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর সাথে সাথে সশস্ত্র শক্তির ওজন সাধারণতঃ স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা কম হয়ে যায়।

❖ সশস্ত্র শক্তির ওজন, পরিমাপ এবং ঘনত্বের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক

যেমন পূর্বে বলা হয়েছে যে, সশস্ত্র শক্তির ওজন একদিকে যেখানে সশস্ত্র শক্তির আঘাত এবং আত্মরক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধি করে অপরদিকে সেখানে সাধারণতঃ স্থানান্তরিত হওয়ার দক্ষতাকে কম করে দেয়। যদিও অতিরিক্ত কিছু অর্থ-সরঞ্জাম এই ত্রুটি মুক্ত করার জন্য অবলম্বন করা হয় কিন্তু তারপরও ওজনের পার্থক্য অসংগঠিত যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সশস্ত্র শক্তির ওজনের ভূমিকাকে ভালোভাবে বোঝার জন্য সশস্ত্র শক্তির ওজনের সাথে তার পরিমাণ এবং ঘনত্বকেও বুঝতে হবে।

সশস্ত্র শক্তির পরিমাপ [volume] এর অর্থ হলো সশস্ত্র শক্তির জনশক্তি এবং অর্থ-সরঞ্জামের বিস্তার। যদি কোনো আসকারী শক্তি একটি শহরের আত্মরক্ষার জন্য তার চাহিদা অনুযায়ী আঘাত হানার এবং প্রতিহত করার শক্তি, এক হাজার জনশক্তি দ্বারা অর্জন করে পক্ষান্তরে অন্য আরেকটি আসকারী শক্তি এই দক্ষতা স্বীয় উত্তম যোগ্যতাবহ জনশক্তি এবং উত্তম হাতিয়ারের সাহায্যে পাঁচশত কর্মীবাহিনীর দ্বারা অর্জন করে নেয়। তাহলে দেখা গেল যে, এই দুইটি আসকারী শক্তির ওজন তো সমান সমানই কেনোনা এই দু'টি শক্তি একই কাজের উপযোগী। কিন্তু প্রথম শক্তির পরিমাপ [volume] বেশি বিধায় তার ঘনত্ব অল্প পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আসকারী শক্তির পরিমাপ [volume] অল্প বিধায় তার ঘনত্ব বেশি।

বস্তুতঃ আসকারী শক্তির ঘনত্বের অর্থ হলো এই যে, প্রয়োজনীয় সশস্ত্র ক্ষমতাকে নূন্যতম অর্থ-সরঞ্জাম এবং নূন্যতম জনশক্তিতে একত্রিত করা।

আসকারী শক্তির ঘনত্বের সব চেয়ে বেশি উপকার তার স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্যতার প্রতি হয়। কেনোনা বেশি পরিমাপ [volume] অবশ্য সশস্ত্র শক্তির স্থানান্তরিত হওয়ার

যোগ্যতাকে কম করে দেয়। সংগঠিত সেনাবাহিনীদের মধ্যেও 'কমান্ডো বাহিনী' এবং 'মেরিন' এই উদ্দেশ্যে সংঘটিত করা হয় যেনো প্রশস্ত পরিমাপ [volume] এর অধিকারী সৈন্যদের মধ্যে কিছু এমন ইউনিটও উপস্থিত থাকে যা অল্প পরিমাপ [volume] এর অধিকারী কিন্তু বেশি ঘনত্ব রাখার কারণে দ্রুত স্থানান্তরিত হওয়ার সক্ষম হয়। সংগঠিত সৈন্যদের মধ্যে তো শুধুমাত্র এই ধরনের কতিপয় ইউনিট থাকে পক্ষান্তরে আসকারী শক্তির ঘনত্বই গোরিলা সৈন্যদের মৌলিক শক্তি হিসাবে আখ্যায়ীত হয়ে থাকে। গোরিলারা নিজেদের বিশেষ পরিস্থিতির কারণে তারা স্বীয় প্রয়োজনীয় সশস্ত্র শক্তির ওজন নূন্যতম জনশক্তি এবং নূন্যতম অর্থ-সরঞ্জাম দ্বারা অর্জন করতে বাধ্য হয়। এর জন্য গোরিলাদের প্রশিক্ষণ মূলতঃ সংগঠিত সৈন্যদের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তারিত এবং সর্বমুখী হওয়া প্রয়োজন।

❖ সশস্ত্র শক্তির প্রকাভেদ

মানব ইতিহাসে অনেক প্রকারের সশস্ত্র শক্তির আর্ভিবাব হয়েছে। সশস্ত্র শক্তিসমূহ সংঘটিত হওয়ার দিক দিয়ে এবং তাদের ধরন প্রত্যেক যুগ এবং প্রত্যেক সমাজ হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন ছিলো। সংঘটিত হওয়ার দিক দিয়ে সশস্ত্র শক্তিসমূহের নিম্নবর্তী প্রকারভেদ উল্লেখ্যযোগ্য।

- কাবাইলী বা গোত্রীয় সেনাবাহিনী।
- শাহী সেনাবাহিনী।
- উম্মাহর সেনাবাহিনী।
- জাতীয় সেনাবাহিনী।
- আন্তরজাতিক সেনাবাহিনী।
- গোরিলা সৈন্য দল।

❖ কাবাইলী বা গোত্রীয় সেনাবাহিনী

ইতিহাসে সবচাইতে বেশি সশস্ত্র শক্তি গোত্রীয় ভিত্তিতে গঠন করা হয়। এর দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ গোত্রসমূহ (তারা চাহে মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম)

নিজেরা নিজেদেরকে বিপদে নিমজ্জিত মনে করতো এবং তারা নিজেদের আত্মক্ষার জন্য সেনাবাহিনী গঠন করতো। দ্বিতীয়তঃ গোত্রের লোকেরা নিজেদের দ্বীন এবং আদর্শের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী সংঘটিত করতো। ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ বলবৎ রয়েছে যেখানে কাবাইল বা গোত্রের লোকেরা দ্বীনের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী গঠন করেছে। যদি এটা বলা হয় তাহলে কোনো অযুক্তি হবে না যে, ইসলামের ইতিহাসের বেশির ভাগ অথবা সব ধরনের বিজয় বিভিন্ন মুসলিম গোত্রের গঠিত সেনাবাহিনীদের হাতে সম্পাদিত হয়েছে। যেমন নবী (সাঃ) এর যুগে আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা দ্বীনের খাতিরেই একত্রিত হয়োছিলো এবং দ্বীনের জন্য জিহাদ করেছিলো।

সালজোক শাহজাদা, জঙ্গি বংশদর এবং সালাউদ্দীন আইয়ুবী (রহঃ) এর দৃষ্টান্তসমূহও এই ধরনের সেনাবাহিনীরই অন্তর্ভূক্ত যারা মূলতঃ গোত্রীয় পেক্ষাপট রাখতো এবং তারা দ্বীনের সাহায্যার্থে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলো।

❖ শাহী সেনাবাহিনী বা রাজকীয় সেনাবাহিনী

রাজকীয় সেনাবাহিনীর গঠনপ্রনালীও মানব ইতিহাসে বার বার হয়েছে। কাফিরদের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ শাহী সেনাবাহিনী সংগঠিত হওয়ার স্তর কাবাইলী বা গোত্রীয় সেনাবাহিনী গঠিত হওয়ার পরে এসেছে। যখন একটি গোত্র ক্ষমতা দখল করে নিতো তখন সেই অঞ্চলের সকল গোত্রের লোকেরা তার বাদশাহীকে ক্রমান্নয়ে কবুল করে নিতো। প্রয়োজনের খাতিরে বাদশাহকে সেনা প্রদান করা গোত্রের লোকদের দায়ীত্ব হতো। এক বাদশাহর অধিনে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের একত্রি কৃত সৈন্যকে শাহী সেনা বলে আখ্যায়ীত করা হতো। শাহী সৈন্যদের আক্বীদা বিশ্বাস ছিলো যে, বাদশাহ আল্লাহর ছায়া তাই তার হিফাযত করা একটি দ্বীনি কর্তব্য। এই বাতিল আক্বীদা বিশ্বাসই তাদেরকে সংঘবদ্ধ রাখতো।

❖ উম্মাহর সেনাবাহিনী

উম্মাহকে ভিত্তি করে গঠিত সশস্ত্র শক্তি মুসলমানদের মাঝে তেরশত বছর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। উসমানী খিলাফতের পতনের পর এই প্রতিষ্ঠিত সশস্ত্র শক্তি বিলিন হয়ে যায়। এই সেনাবাহিনীর ভিত্তি ছিলো এই যে, মুসলমান বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এবং ভৌগলিক সম্পর্ক সব কিছু ভূলে গিয়ে সবাই এক উম্মত হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলেছিলো এবং তারা স্বীয় ব্যক্তি জীবন এবং সামাজিক জীবন দ্বীনকে ভিত্তি করে অতিবাহীত করতো। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা কালিনই মুসলমানদের পক্ষে স্বীয় দ্বীন অনুসারে পূর্ণাঙ্গভাবে জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব।

খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং তার স্থায়ীত্ব ও তার প্রতিরক্ষা জন্য জিহাদ আবশ্যক। এর উদ্দেশ্যেই উম্মাহর চেতনার প্রতি ভিত্তি করে মুসলমানদের সৈন্য গঠিত হয়। উম্মাহর প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বীন, জান ও মাল এবং মান-সম্মান বজায় রাখার জন্য জিহাদে দিফা'আ (প্রতিরক্ষা জিহাদ) এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে প্রসারিত করার জন্য আক্বদামী জিহাদ (জিহাদের পদক্ষেপ নেয়া) এই মুসলিম সৈন্যদেরই দায়িত্ব ছিলো। খলিফার অধিনস্থ আমির উমারাহ, কর্মকর্তাগণ এবং গোত্রীয় সরদারগণ সবই নিজ নিজ সৈন্যদেরকে খিলাফতের সেনাবাহিনীদের অন্তর্ভুক্ত করতো। এমনিভাবে মুসলিম আসকারী নিজাম কর্মতৎপর ছিলো। ইসলামের ইতিহাসে কোনো কোনো যুগে মুসলমানদের প্রচলিত স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিলো যারা সর্বদা শুধুমাত্র জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকতো অর্থাৎ সর্বদা জিহাদের জন্য তৎপর থাকা তাদের একমাত্র কাজ ছিলো। এছাড়া মুসলমানদের খলিফা প্রয়োজন মনে করলে যে কোনো গোত্র বা জাতিকে জিহাদে অংশ্য গ্রহন করার জন্য আহ্বান করতো এবং উম্মত সমষ্টিগতভাবে জিহাদের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতো।

কোনো কোনো আমলে এমনও হয়েছে যে, মুসলমানদের স্থায়ী সংগঠিত সেনাবাহিনী ছিলোই না। সমস্যা হলে তার সমাধানের জন্য বিভিন্ন গোত্র এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মুললিম মুজাহিদরা সমবেত হয়ে জিহাদের জন্য বের হয়ে আসতো। উম্মাহর ভিত্তিতে গঠিত সশস্ত্র শক্তির আরো একটি উপমা ক্রুশেডার যুদ্ধে গঠিত খৃষ্ট্রান সৈন্য

এবং খিলাফতে উসমানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈন্যরাও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সৈন্য রোমের গির্জা ঘরের প্রভক্তাদের আহ্বানে সমস্ত ইউরোপের বাদশাহগণ স্বীয় দ্বীনের সাহায্যার্থে নিজ নিজ সৈন্যদেরকে পাঠায়।

❖ জাতীয় সেনাবাহিনী।

সশস্ত্র শক্তির চতুর্থ প্রকার আধুনিক যুগে প্রকাশ পেয়েছে। ফ্রান্সের বিপ্লবের পর গোটা ইউরোপে ধর্মবিরোধী শক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই বিরোধী শক্তিরা দ্বীনকে রাষ্ট্র হতে পৃথক করার শ্লোগান দেয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপে অনেক পরবির্তন আসে। এ সব পরিবর্তনের মধ্যে বাদশাহ এবং গির্জা ঘরের রাজত্ব বা প্রদান্য বিলিন হয়ে যায়। নতুন সংবিধান প্রচলন করা হয় এবং সংবিধানের অধিনে জাতীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে।

এই সমস্ত গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী রাষ্ট্রসমূহে একটি মহা সমস্যা দেখা দেয়। তাহলে এই যে, যে সকল সেনাবাহিনীরা বিগত দিনে গির্জাঘরের ফতোয়া অনুযায়ী বাদশাদেরকে আল্লাহর ছায়া মনে করতো এবং দ্বীনি উৎসাহ উদ্দিপনা নিয়ে লড়াই করতো এখন তাদেরকে কিভাবে লড়াইয়ে প্রস্তুত করা যায়।

অষ্ট্রেরিয়ার 'জেনারেল ক্লাজভেট' এই মহা সমস্যার সমাধানের জন্য তার নির্বোধ দর্শন উপস্থাপন করে এবং আল্লাহর পরিবর্তে জাতীয় রাষ্ট্রের খাতিরে সৈন্যদেরকে জীবন উৎসর্গ করার উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করে। এই চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে আধুনিক সেনাবাহিনীর উৎপত্তি হয়। সমাজতান্ত্রিক আমলে ইউরোপীয় সেনাবাহিনী 'ক্লাজভেট' এর চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সামরাজ্যবাদ হতে মুক্তি লাভের পর যখন বিশ্বে জাতীয় রাষ্ট্র (Nation State) প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মুসলিম বিশ্বের মুসলিম নামধারী স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ 'ক্লাজভেট' এর চিন্তাধারার আলোকে স্বীয় সেনাবাহিনী সংগঠিত করে এবং এ ব্যাপারে কোথাও তার প্রবর্তীত নিয়ম-নীতি সম্পূর্ণভাবে বলবৎ রাখা হয় আবার কোথাও ইসলামের লেবেল লাগানো হয়।

❖ আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী।

আধুনিক যুগে সশস্ত্র শক্তির পঞ্চম প্রকার আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী রূপে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর বিশ্বের গোটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নকশা পরিবর্তন হতে শুরু করে এই আমলেই শ্রেষ্টত্বের লড়াই বা [Cold War] এর সূচনা

হয়। রাশিয়া স্বীয় সমাজবাদী শাসন ব্যবস্থা বিশ্বে প্রবর্তন করতে চাচ্ছিলো এবং আমেরিকাও তার পূজিবাদী শাসন ব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে ছিলো যার পরিপেক্ষিতে সারা বিশ্ব দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

আমেরিকা জাতীসংঘের ছত্রছায়ায় এবং ইউরোপের সাথে মিলে 'নেটো' নামে একটি সেনাবাহিনী গঠন করে। অপরদিকে আমেরিকা বিশ্বের চতুরদিকে একটি প্রাচীর নির্মাণের জন্য নিজের সেনাবাহিনীকে সম্মিলিত নিয়ন্ত্রণে [United command] আবদ্ধ করতে শুরু করে। এই ভাবে বিশ্বে তিন প্রকারের বিশ্বসেনাবাহিনীর প্রবর্তন হয়।

তন্মধ্যে প্রথমতঃ জাতীসংঘের অধিনস্থ বিশ্ব শান্তিবাহিনী। বিশ্বে যেখানেই পাশ্চাত্যের সামান্য ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয় সেখানেই জাতীসংঘের মেম্বার দেশসমূহের সমন্নয়ে সংগঠিত শান্তিবাহিনী নামধারী World peace force এর সেনাবাহিনীহামলা করে বসে। যেমন এই নামধারী শান্তিরক্ষা বাহিনী এরূপ হামলার জন্য নব্বইয়ের দশকে সোমালিয়া এবং বোসনিয়াতে প্রবেশ করেছিলো।

দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী যাকে আমেরিকা সাতটি সম্মিলিত নিয়ন্ত্রণে [United command আবদ্ধ করেছে। যারা সারা বিশ্বের চতুরদিকে পারমানবিক এবং সাধারণ অস্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

তৃতীয়তঃ 'নেটো' নামক ইউরোপের সম্মিলিত সেনাবাহিনী যারা বিশ্বে ইউরোপের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং জাতীসংঘের ও আমেরিকার সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য গঠন করা হয়েছে। এই সকল বিশ্বসেনাবাহিনী পৃথিবীতে কাফিরদের আধিপত্যকেই শক্তিশালী করেছে। ১৯৯২ সালে আফগানিস্তানে রাশিয়ার পরাজয়ের পর এই বিশ্বসেনাবাহিনী মুজাহিদীন এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এই বিশ্ব সেনাবাহিনীর আরো একটি উদাহরণ 'ইসাফ' নামক সেনাবাহিনীর। এই সেনাবাহিনী নেটো ও অন্যান্য আটচল্লিশটি দেশের সম্মিলিত সেনাবাহিনী নিয়ে গঠিত হয়েছে। আজও এরা আফগানিস্তান দখল করে বসে রয়েছে। এই ধরনের আরো একটি উদাহরণ 'ইমিসোম' নামক সেনাবাহিনীর যাদেরকে আফ্রীকার ক্রুশেডার

আদর্শে বিশ্বাসী ইথোপিয়া, কিনিয়া, ব্রোন্ডী, ইয়োগান্ডা ইত্যাদি দেশসমূহ সংগঠিত করেছে। এই ঐক্য সেনাবাহিনী সোমালিয়াতে আক্রমণ করে বসে রয়েছে।

❖ গোরিলা সৈন্য দল।

সশস্ত্র শক্তিসমূহের আরো এক প্রকার শক্তির ঐ সময় আর্বিভাব হয় যখন কোনো দুর্বল মানব গোষ্ঠী নিজেদের চেয়ে অনেক বড়ো শত্রুর মোকাবেলায় স্বীয় দ্বীন ও আদর্শকে বিপদগামী হতে দেখে তখন তারা নিজেদের চেয়ে অনেক বড়ো শক্তির সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে যে আসকারী বা সশস্ত্র শক্তির আবির্ভাব হয় তাদেরকে গোরিলা শক্তি বলা হয়। গোরিলা শক্তি মূলতঃ এক আদর্শবাহী শক্তির নাম মাত্র। কেনোনা যদি কোনো কাজের পিছনে আদর্শ লুকায়িত না থাকে তাহলে কোনো দুর্বল শক্তি নিজেদের চেয়ে কয়েক গুনে বড়ো শক্তির সাথে যুদ্ধ করার সাহস পেতে পারেনা। মূলতঃ যুদ্ধের সাহস বা উৎসাহ উদ্দীপনা আদর্শই যোগিয়ে থাকে। গোরিলা শক্তি প্রচলিত সেনাবাহিনী ন্যায় গঠিত হয় না বরং সমাজের বিভিন্ন দল বা গোত্র পৃথক পৃথক ভাবে উক্ত বড়ো শক্তির বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায় এবং নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে লড়াইয়ের সূচনা করে। এই সমস্ত দলসমূহ এবং গোত্রসমূহের মাঝে কিছু রীতি-নীতি যৌথভাবে বিদ্যমান থাকে যার ভিত্তিতে এরা একে অপরকে সাহায্য করে। এর পর সমস্ত কাজ সম্পাদন করার দায়িত্ব নেত্রবৃন্দের ওপর অর্পিত হয়। দায়িত্বশীলদের কাজ হলো এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা কাজকে সংগঠিত করা এবং গোরিলাদের মাঝে পারস্পরিক মতবিরোধ মিটিয়ে এক আদর্শে এবং কর্মসূচীতে আবদ্ধ করা এবং তাদের মধ্যে ঐক্যমত সৃষ্টি করা। গোরিলা শক্তির গঠনপ্রণালী সম্পকে আমরা এই বইয়ের আগামী অধ্যায়ে আলোচনা করবো, ইনশা-আল্লাহ।

❖ গোরিলা যুদ্ধ

পরিচিতি

গোরিলা শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো আক্রমণকারী দল এই শব্দটি ইস্পাহানী ভাষা হতে আহরিত হয়েছে যার অর্থ আক্রমণকারী দল বা ক্ষুদ্রযুদ্ধ। এই গোরিলা শব্দটির একাংশ 'গোর' যা পুরাতন জার্মান ভাষা হতে নেয়া হয়েছে। এ থেকে ইংরেজী ভাষার [War] শব্দটির উৎপত্তি।

গোরিলা ঐ সকল অপ্রচলিত সৈন্যকে বলা হয় যার পিছনে রাজনৈতিক স্বার্থ কার্যকর থাকে। গোরিলা অপ্রচলিত সৈন্যের এক কর্মী বা সদস্য হিসাবে পরিগণিত হয়। যার কিছু রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে যেমন বর্তমান সরকারের উৎখ্যাত। এরা ছোট্ট ছোট্ট দল আকারে কাজ করে থাকে।

গোরিলা প্রদ্ধতির যুদ্ধকে ছোট্ট আকারের যুদ্ধ, বিপ্লবী এবং দলীয় যুদ্ধ বলা হয়। আধুনিক যুগে মুজাহিদীনরা অধিকাংশ এই পদ্ধতিতে জিহাদ করছে। প্রত্যেক্ষ ক্ষেত্রে গোরিলা যুদ্ধ দুই আকারে করা হয়ে থাকে যেমন দুর্বল শক্তির পক্ষ হতে সহজ ভাবে চাতুরী অবলম্বন করে বড়ো কোনো শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়। প্রচলিত যুদ্ধের এক পর্যায়ে যেখানে সংগঠিত সেনাবাহিনীরা শত্রুদের অঞ্চলে তাদের পশ্চাতে গিয়ে যুদ্ধ করে। এই পদ্ধতির যুদ্ধেও কায়দা কানুন ও উপাদান প্রচলিত যুদ্ধের অনুযায়ীই হয়ে থাকে চাহে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতোই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হোক না কেনো।

❖ আধুনিক যুগে গোরিলা যুদ্ধের ইতিহাস

গোরিলা যুদ্ধের সাথে পাশ্চাত্যদের বার বার সম্মুখিন হতে হয়েছে ইতিহাসে যার অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ব্রিটিশ সরকার ও ফ্রান্স গোটা মুসলিম বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করেছিলো তখন তাদেরকে দখলকৃত সব দেশেই গোরিলা যুদ্ধের সম্মুখিন হতে হয়। তন্মধ্যে আলজিরিয়ায় আব্দুল কাদের

(রহঃ) এর আন্দোলন, সুডানে মেহেদী সুডানীর আন্দোলন, হিন্দুস্তানে তাহরিকে মুজাহিদীনদের আন্দোলন এবং এরূপ অন্যান্য আরো বিপ্লবী আন্দোলনসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে গোরিলা যুদ্ধের দ্বিতীয় ঢেউ প্রথম মহা যুদ্ধের পর উঠে। এই যুগে উত্তর আফ্রীকা, মধ্য এশিয়া এবং ফিলিস্তীনে অনেক জিহাদী আন্দোলন গড়ে উঠে। তন্মধ্যে আলজিরিয়ায় আব্দুল কাদের (রহঃ) এর আন্দোলন, লিবিয়াতে উমর মুখতার (রহঃ) এর আন্দোলন এবং ফিলিস্তীন ও সিরিয়ায় ইজ্জুদ্দীন কাছ্ছাম (রহঃ) এর জিহাদী আন্দোলন উল্লেখ যোগ্য। পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে গোরিলা যুদ্ধের তৃতীয় ঢেউ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর আধিপত্যবাদীদের কবল থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে উঠে। ঐ যুগে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আলজিরিয়াতে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। এই যুদ্ধ পাশ্চাত্যকে গোরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। আলজিরিয়াতে স্বাধীনতা সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য ফ্রান্সের সেনাবাহিনীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যবৃত্তের নেতাদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করতে শুরু করে। এই পরিকল্পণায় ফ্রান্সের সেনাবাহিনীদের কিছু সফলতা অর্জন হয়েছিলো তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র শক্তিকে নস্যাৎ করতে সক্ষম হয়। অথচ ফ্রান্স রাজনৈকিতভাবে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে কিন্তু এই যুদ্ধে গোরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে পাশ্চাত্যদের চিন্তাধারায় বিপ্লবাত্তক পরিবর্তন সৃষ্টি করে। তারা এই কথাকে ভালোভাবে জেনে নিয়েছে যে, গোরিলা যুদ্ধ মূলতঃ একটি আদর্শিক যুদ্ধ। এই চিন্তাধারাকে এক নেতা কার্যকরি করে থাকে। যদি এই নেতার জীবন নাশ করা যায় তাহলে এই যুদ্ধে বীজয় লাভ করা সম্ভব হয়।

গোরিলা যুদ্ধের চতুর্থ বড়ো তুফান রাশিয়া ও আমেরিকার মাঝে শ্রেষ্টত্বের লড়াই কালে শুরু হয়। এই শ্রেষ্টত্বের লড়াইতে রাশিয়া গোরিলা আন্দোলনের মাধ্যমে আমেরিকার সমর্থক দেশসমূহে শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটায়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটানো রাশিয়ার সরকারী নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলো। রাশিয়ার এই নীতিকে বিপ্লবী নীতি বলা হতো। এই ভাবে সে বিশ্বে নিজের চিন্তাধারার প্রচার করতো। রাশিয়া এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রীকা এবং আমেরিকাতে বুদ্ধিজীবি, শ্রমিক এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মাঝে বিপ্লবী ধ্যান-

ধারণা সৃষ্টি করতো। এরপর সেখানে গোরিলা যুদ্ধ শুরু করা হতো যার পৃষ্টপোশকতা রাশিয়া সরাসরিভাবে নিজেই করতো। রাশিয়ার এই নীতির কারণে সে পূর্ব ইউরোপ, আফ্রীকা, পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশগুলোতে সফলতাও অর্জন করেছিলো। শ্রেষ্টত্বের যুদ্ধে রাশিয়ার এই নীতির কারণে আমেরিকা ভীত সন্ত্রস্ত ছিলো এবং একে বাধা দেয়ার জন্য সে অনেক কর্মসূচীও গ্রহন করেছিলো। আমেরিকার কর্মসূচীর মধ্যে গুপ্ত জাহাজের ব্যবহার উল্লেখ যোগ্য ছিলো।

গোরিলা যুদ্ধের দু'শত সালের ইতিহাস গবেষণা করলে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, গোরিলা যুদ্ধ স্বীয় কারণ বশতঃ দুই রকমের হয়ে থাকে। যেমন সাধারণতঃ কোনো বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের কারণে গোরিলা যুদ্ধের সূচনা হয়। এতে জনগণের মধ্য হতে এক দল স্বীয় ধর্ম অথবা দেশের ওপর হস্তক্ষেপ মনে করে কিংবা নিজেদের স্বার্থের ওপর হামলা মনে করে অথবা স্বীয় ধর্ম ও জাতিকে আক্রমণ কারী সৈন্যদের চেয়ে ভালো মনে করে। অতপর এই দল আবার জনগণকে বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে। গোরিলা যুদ্ধের এই দিকটা জনগণের মধ্যে অত্যন্ত গ্রহন যোগ্য ও ফলপ্রসু হয়ে থাকে। এতে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল গোরিলা যুদ্ধ ইংরেজ আধিপত্যবাদ, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে শিশান, মধ্য এশিয়া এবং কাবাইলী অঞ্চলে করা হয়েছে তা উল্লেখ যোগ্য। গোরিলা যুদ্ধের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক যার পরিপ্রেক্ষিতে গোরিলা যুদ্ধের সূচনা হয় তা হলো এই যে, দেশের শাসন ব্যবস্থা দেশের জনগণের মনঃপুত নয় যার জন্য দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে অথবা দেশ এক দলীয় স্বৈরশাসনের কারণে জনগণের মাঝে অশান্তির ঝড় বয়ে চলেছে। যখন দেশের অবস্থা আগ্নেয়গিরির ন্যায় হয় তখন শুধুমাত্র একটি অগ্নিশিখার প্রয়োজন হয়। গোরিলা নেতাগণ এতে শুধুমাত্র অগ্নিশিখার কাজ সম্পাদন করে তারপর ঝড় বইতে শুরু করে। কিন্তু এই পদ্ধতি অনেক কঠিন এবং এতে সফলতার সম্ভবনা অনেক কম। এর মৌলিক কারণ হলো এই যে, গোরিলাদেরকে নিজের জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে হয়। এই যুদ্ধ বেশির ভাগ ঘরোয়া যুদ্ধে পরিণত হয়। যার কারণে জনগণ বিপদের সম্মুখিন হয়ে

পড়ে। এই ভাবে গোরিদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আশঙ্কার সম্মুখিন হয় অথবা তারা জনগণের মাঝে এমন এক পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তাদের সম্মান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতির কারণে অন্য কোনো তৃতীয় শক্তি এর থেকে উপকৃত হয়ে ক্ষমতা দখল করে বসে। এর বড়ো দৃষ্টান্ত আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদীনদের সফলতা কেনোনা সাধারণ মুজাহিদীনদের মাঝে পরস্পরে মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে জনগণ বিতৃষ্ট হয়ে তালেবান মুজাহিদদের সমর্থন করে।

আধুনিক যুগে গোরিলা যুদ্ধের পঞ্চম পর্যায়ের সূচনা ঐ সময় হয় যখন ইরাক কুয়েত যুদ্ধের শায়খ উসামাহ বিন লাদেন (রহঃ) আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করে। এটা একটা বিশ্ব যুদ্ধও ছিলো এবং স্থানীয় যুদ্ধও। এই যুদ্ধের দুইটি পর্যায় ছিলো। প্রথম পর্যায় ৯/১১ এর হামলার পূর্বেকার এবং এর দ্বিতীয় পর্যায় ৯/১১ এর পর শুরু হয়। প্রথম দিকে মুজাহিদদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম উম্মাহর মাঝে জিহাদকে জীবিত করা এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে এমনভাবে হামলা করা যাতে আমেরিকা তার সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে প্রসারিত করতে বাধ্য হয়। কেনোনা আমেরিকাকে তার সংগঠিত সেনাবাহিনীর কারণে যুদ্ধে পরাজিত করা সম্ভব ছিলো না। প্রথম আরব উপসাগর যুদ্ধ থেকে নিয়ে ৯/১১ পর্যন্ত মুজাহিদদের একের পর এক ওতপ্রোত হামলার কারণে আমেরিকা তার সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করাতে বাধ্য হয়। মুজাহিদদের এই পদক্ষেপ নেয়ার কারণে মুসলিম উম্মাহর মাঝে চেতনার ঢেউ সৃষ্টি হয়। আল্লাহর রহমতে মুজাহিদদের দুইটি উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। আমেরিকা তার সেনাবাহিনীকে বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে নিয়েছে এবং জিহাদ আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, ইয়েমেন, নাইজিরিয়া, সোমালিয়া এবং ফিলিপাইন প্রর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। জিহাদের প্রথম পর্যায় থেকে নিয়ে তার শেষ পর্যায় পর্যন্ত গোরিলা যুদ্ধের ভাবধারাতে প্রচুর প্রসারিত হচ্ছে। জিহাদের এই ময়দান আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীন পর্যায়ে প্রসারিত হয়েছে। মোট কথা জিহাদ এখন বিশ্বজোড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এই যুদ্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা একই রকম কিন্তু কর্মক্ষেত্রের দিক দিয়ে প্রত্যেক দেশ ও স্থান পরস্পর এক অপর হতে একেবারেই ভিন্ন। এখন মুজাহিদদের সম্মুখে দেশ ও স্থান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন

পরিস্থিতি বিরাজমান করছে। কোনো কোনো দেশে বিদেশীরা হস্তক্ষেপ করে বসে রয়েছে। কোনো কোনো দেশের আভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। আবার কোথাও এতদয়ের মধ্যে কোনোটাই বিরাজমান নেই কিন্তু তারপরও দেশে ইসলাম বিরোধী এবং ত্বাগুতী সরকারের উপস্থিতিই মুজাহিদদের জন্য জিহাদ বলবৎ রাখার কারণে পরিগণিত হয়ে রয়েছে। এই বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি গোরিলা যুদ্ধকে আরো বেশি কঠিন করে তুলেছে। প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী যুদ্ধকে সংগঠিত করা মুজাহিদদের জন্য বর্তমান যুগের সব চাইতে বড়ো পরিক্ষা হিসাবে দাঁড়িয়েছে।

○ গোরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি

যেহেতু গোরিলা যুদ্ধ একটি দুর্বল পক্ষ নিজেদের থেকে বেশি শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে লড়াইতে লিপ্ত হয় বিধায় এ ধরনের যুদ্ধে মুখোমুখি হওয়া সম্ভব হয় না। এই যুদ্ধ দুই আকারে লড়া হয়। প্রথমতঃ যখন কোনো বিদেশী শক্তি কোনো দেশে প্রবেশ করে তখন তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য সেই দেশের গরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক স্থানসমূহ বলপ্রয়োগ করে দখল করতে হয়। দেশের গরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক স্থান দখল করার পর উক্ত অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তার চেষ্টা হয় সেই দেশের শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা কেনোনা শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে তার উচ্চতর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। এই সময়ই গোরিলারা এই বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ কোনো দেশের শাসক মুরতাদে পরিণত হয়েছে অথবা উক্ত দেশের শাসন ব্যবস্থা বিপর্যয়ে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত বাতিল শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আগ্রহি ব্যক্তিবর্গরা এক চিন্তাধারায় একত্রিত হয়ে উক্ত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সূচনা করে। এই দুই আকারে যদিও প্রত্যেক্ষ ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায় কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য একই হয়ে থাকে অর্থাৎ বিদেশী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে না দেয়া এবং অন্য আকারে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত হতে না দেয়া এবং শাসন ব্যবস্থার পতনের পর নিজেদের শাসন

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। যদি এই শত্রু স্বীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না করতে পারে তাহলে সে তার উচ্চতর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। এই বুনিয়াদী উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য গোরিলা যুদ্ধকে এমনভাবে সংগঠিত করা হয় যাতে শত্রুরা বুঝতে পারে যে, তাদের উচ্চতর উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। যদি কিছু অর্জন হয়ও তাহলে এর জন্য তাকে এতো বড়ো খেসারত দিতে হবে এতে তার কোনো লাভ হবে না বরং লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে।

❖গোরিলা যুদ্ধের মূলনীতি

গোরিলা যুদ্ধ মূলতঃ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাহে এ যুদ্ধ বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে হোক অথবা প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই হোক। এই দুই দিক দিয়েই শাসন ব্যবস্থার পতনই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যে কোনো দেশের শাসন ব্যবস্থার পতনের জন্য নিম্নলিখিত পাঁচটি মূলনীতি অবলম্বন করতে হয়।

- যে উদ্দেশ্যে এই শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তীত হয়েছে তার পথে বাধা সৃষ্টি করা।
- এই শাসন ব্যবস্থাকে কার্যকর হতে না দেয়া।
- এই শাসন ব্যবস্থাকে যে সকল প্রতিষ্টান শক্তিশালী করে সেগুলোকে দুর্বল করা।
- জনগণকে এই শাসন ব্যবস্থা হতে দূরে রাখা।
- জনগণকে এই শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য আরেকটি কর্মসূচীতে আবদ্ধ করা।

❖ গোরিলা যুদ্ধের স্তরসমূহ

গোরিলাদেরকে নিজেদের উদ্দেশ হাসিল করার পথে সেই সময় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হতে হয় যখন শত্রুদের আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্টান যেমন পুলিশ, এলিট ফোর্স এবং সেনাবাহিনী সবই গোরিলাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে শুরু করে। গোরিলাদের নিকট সীমিত অর্থ-সম্পদ থাকার কারণে তারা একই সময় নিজেদের

দুইটি লক্ষবস্তুর সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয় না। তাই তাদের স্বীয় যুদ্ধকে নিম্নবর্তী স্তরে বিভক্ত করতে হয়।

- পিছনের দিকে প্রত্যাবর্তন করার পর্যায়
- সংগঠনকে নতুন করে গড়ার স্তর।
- শক্তি অর্জনে শত্রুদের সমমানে আসার স্তর।
- শাসন ব্যবস্থাকে অকেজো করে ফেলার স্তর।
- রাজনৈতিক সংলাপ করার পর্যায়।
- অস্থায়ী অবস্থার স্তর।
- বিজয়ের স্তর।

❖ **(কৌশলগত) পশ্চাদপসরণ করার পর্যায়**

গোরিলা যুদ্ধের সূচনা সাধারণতঃ কোনো বিদেশী শক্তির আক্রমণের ফলে অথবা দেশের আভ্যন্তরে উপস্থিত দলীয় কোন্দল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অথবা কোনো সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের ফলে হয়ে থাকে। এই চুক্তি ভঙ্গের ফলে সশস্ত্র অপারেশন শুরু হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে সংগঠিত সেনাবাহিনী স্বীয় সকল শক্তি পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করে। তাই এ পর্যায়ে সংগঠিত সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করা গোরিলাদের পক্ষে পুরোপুরি সম্ভব হয়ে উঠে না বিধায় তারা কিছুদিন লড়াই করার পর ময়দান হতে কৌশলগতভাবে পিছটান দেয়।

সংগঠনকে নতুন করে গড়ে তুলার স্তর।

গোরিলাদের ময়দান হতে পিছটান দেয়ার পর বিদেশী সৈন্য বা দেশী সৈন্যরা দখল করে নেয়। তারপর তারা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চৌকি ও ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় আধিপত্য শক্তিশালী করে। এই পর্যায়ে গোরিলারা তাদের সংগঠনকে নতুন করে সংগঠিত করে যুদ্ধে অবতরণ করে। এখান থেকে গোরিলা যুদ্ধের প্রথম স্তরের সূচনা হয় যার উদ্দেশ্য প্রচলিত সেনাবাহিনীকে আত্মরক্ষায় বাধ্য করা হয়। সাধারণতঃ গোরিলাদের প্রাথমীক পর্যায়ের সশস্ত্র অভিযানের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য

নিহিত থাকে। প্রথমতঃ সেনাবাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর অনবরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হামলার মাধ্যমে তাদেরকে আত্মরক্ষায় বাধ্য করা হয়। এই পর্যায়ে গোরিলা অভিযান পল্লি অঞ্চলে অথবা শহরের দূরবর্তী এলাকা হতে শুরু করা হয়। অবিরাম আক্রমণের ফলে শহরের দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে শত্রুদের আইন কানুন শেষ হয়ে যায় এবং তাতে শত্রুদেরকে আত্মরক্ষায় বাধ্য হতে হয়। গোরিলাদের এই কর্মপন্থা সেনাবাহিনীকে ব্যস্ত রাখার নীতি বলে অভিহিত করা হয়। এই কর্মনীতির আবার দুইটি দিক রয়েছে। প্রথমতঃ সেনাবাহিনীকে স্বীয় ক্যাম্পের চারিদিকে ব্যস্ত করে তুলা। দ্বিতীয়তঃ তাদের এক অংশকে স্বীয় ক্যাম্প হতে বাহিরে এনে কোনো বিরারভূমিতে ব্যস্ত করা। এই কর্মপন্থার মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে গোরিলাদের কেন্দ্র হতে দূরবর্তী এমন কোনে দিকে ব্যস্ত করা হয় যাতে গোরিলাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে সৈন্যরা আক্রমণ করতে না পারে।

গোরিলাদের দ্বিতীয় কর্মপন্থা যা তারা সচারাচর অবলম্বন করে থাকে সেটা হলো এই যে, গোরিলারা স্বীয় নিরাপদ আশ্রয়স্থলের নিকটতম এলাকা হতে সরকারী আধিপত্য উৎখ্যাত করে নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে আসে। এই কর্মপন্থা অবলম্বন করার পর সমস্ত শহরের দূরবর্তী পল্লি অঞ্চল হতে ক্রমাগত সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রন শেষ হয়ে পড়ে। যার ফলে সমস্ত শহরগুলো মুজাহিদদের বেষ্টনীতে এসে যায়। যদি আমরা আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদদের রীতিনীতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করে দেখি তাহলে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবো যে, আফগানিস্তানে আমেরিকার হস্তক্ষেপের পর গত দশ বছর যাবৎ তালেবান মুজাহিদীন এই নীতিই অবলম্বন করে আসছিলো। যদি গোরিলাদের এই কর্মপন্থা ঐতিহাসিক ভাবে বিশ্বজনীন হয়ে থাকে তাহলে এর কোনো না কোনো কারণ নিশ্চয় হবে। এর সবচাইতে বড়ো গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো এই যে, গোরিলা যুদ্ধে গোরিলাদের সশস্ত্র শক্তিকে নিরাপদ করার জন্য সর্বদাই নিরাপদ আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন হয়। যে সমস্ত নিরাপদ আশ্রয়স্থল শহরের বাহিরে পুলিশ ও সরকারী অধিকৃত এলাকাগুলোতে ছিলো তা পুলিশের হস্তক্ষেপের কারণে সীমিত হতে থাকে। দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে, শহরের দূরবর্তী এলাকাগুলোকে সরকারী আওতার বাহিরে নিয়ে আসার লাভ হলো এই যে, শহরের

সমস্ত রসদ গোরিলাদের হাতের মুঠে এসে যায়। তাই গোরিলারা বিনাদখলেই শহরসমূহের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

শক্তি অর্জনে শত্রুদের সমমানে আসার স্তর

তৃতীয় পর্যায়ে গোরিলাদের দাওয়াতী, রাজনৈতিক, গণমাধ্যম এবং সামাজিক শাখাও কাজ শুরু করে। এ পর্যায়ে এক দিকে গোরিলারা স্বীয় কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি (জনগণের মাঝে) উপস্থাপন করে থাকে এবং অপর দিকে তাদের সশস্ত্র অভিযান পল্লি অঞ্চলের সাথে সাথে প্রশাসনিক এলাকাগুলোতে প্রসারিত হতে থাকে। এছাড়া জনগণের সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জনগণ বেশি বেশি করে সশস্ত্র সংগ্রামে যোগদান করতে শুরু করে। এ অভিযানের উপকার এই হয় যে, সেনাবাহিনী ও আইন প্রয়োগকারীদের অভিযান বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই পর্যায়ে গোরিলাদের চেষ্টা এই হয়ে থাকে যে, শত্রুদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হোক আর এ ক্ষতিপূরণের পূর্ণ ক্ষমতা যেনো তাদের পক্ষে সম্ভব না হয়। এ পর্যায়ে অবশেষে শত্রুরা এ কথা ভাবতে শুরু করে যে, তারা এই যুদ্ধে সশস্ত্র শক্তির মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

এই দিকটাকে আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করবো। যদি মুজাহিদীন দশটি গাড়ী ধ্বংস করে তন্মধ্যে শত্রুরা শুধুমাত্র সাতটি গাড়ী পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে তাহলে মুজাহিদদের একই অভিযানে শত্রুদের তিনটি গাড়ী কম হয়ে গেলো। এর অর্থ হলো এই যে, মুজাহিদদের এক একটি অভিযানে প্রত্যেক দশটি গাড়ী ধ্বংস হওয়ার পর শত্রুদের তিনটি গাড়ী কম হতে থাকবে। এই ভাবে একশত গাড়ী ধ্বংসের পর যুদ্ধের ময়দানে তিরিশটি গাড়ী কম হবে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিরিশটি গাড়ী পূর্ণ করার জন্য সেনাবাহিনীকে নতুন করে গাড়ী ক্রয় করতে হবে। যদি নতুন তিরিশটি গাড়ী সাথে সাথে ধ্বংস করা হয় এবং পুরাতন গাড়ীর মধ্য হতে কিছু ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে সেনাবাহিনীকে পঞ্চাশটি গাড়ীর প্রয়োজন হবে কিন্তু এখন তাদের নিকট তিরিশটি গাড়ী ক্রয় করার সামর্থ রয়েছে তা

দ্বারা তারা তিরিশটি ক্রয় করে নিবে এবং এর পরও বিশটি গাড়ীর প্রয়োজন হবে। এই ভাবে শত্রুদের ক্ষতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকেবে।

শাসন ব্যবস্থাকে অকেজো করে ফেলার স্তর।

এ পর্যায়ে যখন পল্লি, শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং শহর এলাকায় গোরিলাদের অভিযান শক্তিশালী হয়ে উঠে তখন তারা ক্ষমতাসীনদের সকল বিভাগ ও কর্মক্ষেত্রকে অচল করার চেষ্টা করে। এর মধ্যে সরকারী বড়ো বড়ো প্রতিষ্টানের ওপর হামলা চালানো হয় এর সাথে সাথে পানি, বিদ্যুত এবং যোগাযোগের সকল পথকে অকেজো করে তোলা হয়।

রাজনৈতিক সংলাপের স্তর বা পর্যায়।

যদি শত্রুরা এ কথা উপলব্ধি করতে পারে যে, তারা হয়তো সশস্ত্র শক্তির দ্বারা যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারবে না। অথবা তারা কোনো ক্রমেই বিজয়ই হতে পানেবেনা তখন তারা গরিলাদের সাথে রাজনৈতিক সংলাপের জন্য আহ্বান জানায়। এই পর্যায়ে যদি জনগণের সমর্থন গোরিলাদের সাথে হয় তাহলে জনগণের পক্ষ হতে সরকারের পদত্যাগের দাবীতে আন্দোলন গড়ে উঠে যা বর্তমান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। যদি গোরিলারা বেশি শক্তিশালী না হয় তাহলে তারা সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতায় আসে এবং ক্ষমতায় অংশ নিতে প্রস্তুত হয়।

অস্থায়ী অবস্থার স্তর।

এই পর্যায়টি হলো গোরিলা যুদ্ধের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই পর্যায়ে বিজয় পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে কিন্তু এ বিজয়ের ফল এখনো হাতে আসেনি বরং ক্ষমতা দখলের সূত্রপাত করতে হবে। এই সময় যদি গোরিলা নেতাগণ জোরালো দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী হয় এবং গোরিলাদের নিকট সুদক্ষ ক্ষমতাবান লোক থাকে যারা এই পরিস্থিতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় তাহলে এই অস্থায়ী পর্যায়ও অতিবাহিত হয়ে যায়। আর যদি এই মুহূর্তে গোরিলাদের নিকট দক্ষ লোক না থাকে তাহলে অনেক রক্তপাতের আশঙ্কা হয়।

বিজয়ের স্তর।

ক্ষমতা দখলের পর গোরিলাদের প্রকৃত পরিক্ষার সূচনা হয়। তা হলো এই যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা ময়দানে অবতরণ করেছিলো তা পূরণ করার সময় এসে গেছে।

❖ গোরিলা যুদ্ধের মৌলিক ইতিবৃত্ত

প্রকৃতপক্ষে কোনো বস্তুর মৌলিক বৃত্ত সেই কেন্দ্রবিন্দু অথবা উপাদান বা পদার্থ হয়ে থাকে যা ছাড়া বস্তু স্বীয় প্রকৃত আকার ধারণ করতে পারে না। অন্য কথায় মৌলিক বৃত্ত একটি বিল্ডিং এর সেই স্তম্ভ হয়ে থাকে যার ওপর বিল্ডিং দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইতিহাস অধ্যয়ন এ কথাকে প্রমাণীত করেছে যে, গোরিলা যুদ্ধ পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যদি এর থেকে কোনো একটি স্তম্ভ নিপতিত হয় তাহলে গোরিলা যুদ্ধকে কায়েম রাখা দুস্কর হয়ে উঠবে। নিম্নে আমরা এই মৌলিক দিকগুলো তুলে ধরছি।

১) চিন্তাধারা
২) নেতাবৃন্দ
৩) জনগণের সমর্থন.
৪) ভৌগলিক স্থান (নিরাপদ আশ্রয়স্থল)
৫) রাজনৈতিক সমর্থন

❖ চিন্তাধারা

গোরিলা যুদ্ধ একটি আদর্শিক যুদ্ধ। যুদ্ধ সম্পর্কিত পারদর্শী ব্যক্তিরা এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছে যে, আদর্শ ছাড়া গোরিলা যুদ্ধ হতে পারে না। এর কারণ হলো এই যে, আদর্শই দুর্বলকে নিজের চাইতে অনেক বেশি শক্তির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে। বরং এটা বললে অতুক্তি হবে না যে, গোরিলারা স্বীয় আদর্শের বিনিময়ে নিজেদের জীবনকে বিলিন করতে কোনো দ্বিধাবোধ করে না। আদর্শিক দিক দিয়ে গোরিলা যুদ্ধে তিনটি উপাদান রয়েছে। যেমনঃ (১) দ্বীনকে ভিত্তি করে গোরিলা যুদ্ধ। (২) বিপ্লবী গোরিলা যুদ্ধ। (৩) জাতি ও গোত্রকে কেন্দ্র করে গোরিলা যুদ্ধ।

❖ নেতাবৃন্দ

গোরিলা যুদ্ধের দ্বিতীয় বড়ো গুরুত্ববহ উপাদান চরিত্রবান, দক্ষ এবং স্বীয় আদর্শের সাথে একনিষ্ঠ সেই নেতাবর্গ যারা গোরিলাদেরকে সংগঠিত করে যুদ্ধ গড়ে তুলে। যদি আমরা গোরিলা যুদ্ধের ইতিহাস তল্লাশ করে দেখি তাহলে আমরা অবগত হতে

সক্ষম হবো যে, গোরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব ব্যুৎপত্তির অধিকারী ব্যক্তিরা করে থাকে। গোরিলা নেতৃত্বের সব চাইতে বড়ো কাজ এটাই হয়ে থাকে যে, তারা নিজেদের উচ্চতর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে কখনো কোনো ধরনের লেন-দেন বা সমঝোতা করে না। তাদের মধ্যে যে দক্ষতা থাকা একান্ত প্রয়োজন তা হলো এই যে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একনিষ্ঠতা, এর বিজয়ের প্রতি বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী যুদ্ধের প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধের পর পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ। এই সমস্ত দক্ষতায় শক্তিশালী হওয়ার ওপর নির্ভর করে গোরিলা যুদ্ধের সফলতা এবং এর দুর্বলতার ওপর নির্ভর করে গোরিলা যুদ্ধের পরাজয়।

❖ জনগণের সমর্থন

গোরিলা যুদ্ধের তৃতীয় উপাদান জনগণের সাধারণ সমর্থন। এ সমর্থন দু'ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ সাধারণ সমর্থন যা জনগণের পক্ষ হতে গোরিলাদের ওপর নির্ভর এবং তাদের কর্মপদ্ধতির সাথে ঐক্যমত পোষন করা। দ্বিতীয়তঃ জন সাধারণের বিশেষ সমর্থন যা ঐ সব অঞ্চলে অর্জিত হয় যেখানে গোরিলারা আশ্রয় নিয়ে থাকে। গোরিলাদের পরিভাষায় এই এলাকাকে 'মাহফুয পানাহগাহ অর্থাৎ নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলা হয়। গোরিলাদের যারা ওতপ্রোতভাবে সমর্থন করে তাদেরকে 'আনসার' বলা হয়।

❖ ভৌগলিক স্থান (নিরাপদ আশ্রয়স্থল)

গোরিলা যুদ্ধের চতুর্থ উপাদান নিরাপদ আশ্রয়স্থল। যেখান থেকে গোরিলারা প্রশিক্ষণ নিয়ে শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালায়। নিরাপদ আশ্রয়স্থল সাধারণতঃ পাহাড়, পর্বতের গুহা, বণ-জঙ্গল এবং মরুভূমিতে হয়ে থাকে যেখানে সংগঠিত সেনাবাহিনীদের অভিযান অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। এই আশ্রয়স্থলে গোরিলাদেরকে জনগণের সমর্থন, রাজনৈতিক সমর্থন, সশস্ত্র সমর্থন, সরকার ও সরকারী বাহিনীর অভিযান হতে আত্মরক্ষা এবং অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা অর্জিত হয়। গোরিলাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযানের মূল লক্ষ্য গোরিলাদেরকে স্বীয় নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে বঞ্চিত করা।

❖ রাজনৈতিক সমর্থন

গোরিলা যুদ্ধের জন্য জনগণ ও সমাজের মাঝে এমন একটি রাজনৈতিক শক্তি বলবৎ থাকা দরকার যারা গোরিলাদের সংগ্রাম চলাকালিন রাজনৈতিক, চারিত্রিক সমর্থন এবং প্রতিহতের ব্যবস্থা করবে। এই রাজনৈতিক শক্তি কখনো কখনো রাজনৈতিক দলের আকারেও হয় এবং কখনো কখনো কোনো বিদেশী সরকারের রূপেও সামনে আসে এবং বেশিরভাগ এ শক্তিসমূহ গণ-আন্দোলনের আকারে সম্মুখে আসে।

❖ গোরিলা যুদ্ধ এবং সমাজ

পরিচিতি

সমাজ যে কোনো সশস্ত্র শক্তি সৃষ্টির একটি দিক মাত্র। যেমন প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, গোরিলা যুদ্ধের আকারে সমাজ যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গোরিলা যুদ্ধের সময় এটাও লক্ষ্য রাখার দরকার যে, গোরিলা যুদ্ধ সমাজেই ঘটে। এই জন্য সমাজ না শুধুমাত্র শক্তি সঞ্চয়ে সম্পদ এবং জনশক্তি যোগায় বরং সমাজ অধিকাংশ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় এ পরিস্থিতিতে পদক্ষেপ এবং আত্মরক্ষা সব ব্যাপারই সমাজে ঘটে থাকে। এর সাথে সাথে সমাজই মুজাহিদদের দাওয়াত অনুসারে নেতৃত্ব সরবরাহ করে এবং রাজনৈতিক ময়দানে মুজাহিদদের দাওয়াতের বিরোধীতাকে প্রতিহত করে। গোরিলা যুদ্ধ করার জন্য সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বুঝা প্রয়োজন। গোরিলা যুদ্ধে সমাজের ভূমিকা নিম্নোক্ত দিক দিয়ে হয়ে থাকে।

(১) জনশক্তির প্রদান, (২) অর্থ-সম্পদ যোগান (৩) রাজনৈতিক ও দাওয়াতী শাখার সহায়তা (৪) গোরিলাদের আশ্রয় স্থলের ব্যবস্থা, (৫) গোরিলদের স্বার্থে আন্দোলন

❖ গোরিলা যুদ্ধ এবং সমাজের বিভিন্ন দিক

গোরিলা যুদ্ধে সমাজের গুরুত্বকে স্বীকার করা ছাড়া কোনো উপায় নেই এজন্য যেকোনো সমাজে গোরিলা যুদ্ধের সূচনা করার আর্গে নিম্নোক্ত দিকগুলোর জ্ঞান রাখা অত্যন্ত আব্যশ্যক।

(১) দেশ ও সমাজের ইতিহাস (২) সমাজের সকল স্তরের লোক এবং দল সম্পর্কে জ্ঞান (৩) দেশের শাসন ব্যবস্থার ইল্‌ম (৪) গোরিলাদের যোগ্যতা।

❖ দেশ ও সমাজের ইতিহাস

প্রত্যেক দেশ এবং তার সমাজ একটি বিশেষ ইতিহাসের সাথে জড়িত রয়েছে। এ ইতিহাস কোনো দীর্ঘ ইতিহাস নয় বরং এ ইতিহাসের সূচনা ঐ সময় হতে আরম্ভ হয় যখন এ দেশ বিশ্বের বুকে জন্ম নিয়েছে এবং এ দেশ ও সমাজকে প্রতিষ্ঠা ও গড়ার জন্য যে নেতৃত্ব করেছে। যে এ দেশ ও সমাজ এর পরিচয় বিশ্বের বুকে তুলে ধরেছে। সমাজের কোনো না কোনো ব্যক্তি এই ইতিহাসের সাথে জড়িত রয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক দেশ, সমাজ এবং মানুষ এমন একটি ইতিহাস

ও ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে যে তার জীবনে একটি অক্ষয় নেতিবাচক ও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। এ ইতিহাস সে দেশের জাতি ও সমাজের মাঝে প্রবাদ বাক্য বা উপমা হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছে। এ ইতিহাস সে সমাজের জনগণের স্মৃতিতে এতো বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে, সে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে এ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই তা দেখে থাকে। বস্তুতঃ ইতিহাস এমন এক চশমার সমতুল্য যার দ্বারা পৃথিবীর সব ব্যাপার, সব ঘটনা পরীক্ষা নিরিক্ষা করে থাকে।

এ কথাটিকে একটি উদাহরণ এর মাধ্যমে পরিস্কার করতে চেষ্টা করবো। হিন্দুস্তানে শির্ক এর ইতিহাস অনেক পুরাতন এবং হাজার হাজার বছর ধরে পরিবেষ্টিত কিন্তু মাহমুদ গযনুবীর আক্রমণের ফলে এখানকার লোকদের মধ্যে একটি নতুন দ্বীন তথা ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করে যা সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এমনিভাবে হিন্দুস্তানে মুসলমানরা একটি নতুন জাতি হিসাবে আবির্ভাব করে। যখন হিন্দুস্তানকে ইংরেজরা দখল করে তখন ইতিহাস একবার নতুন রূপ ধারণ করে। হিন্দুস্তান ১৯৪৭ সালে বিভক্তির ফলে তিনটি দেশে পরিবর্তন হয়। হিন্দুস্তানের এই পরিপূর্ণ ইতিহাস এবং এতে সংঘটিত ঘটনা সারা দেশের মুসলিম অথবা হিন্দু অধিবাসীদের স্মৃতিতে এক অক্ষয় চিহ্ন বদ্ধমূল করেছে। এখানকার অধিবাসীরা প্রত্যেক বড় ব্যাপারকে এই ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলির দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে। গোরিলা যুদ্ধ একটি সামাজিক যুদ্ধ বিধায় এ যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত আবশ্যক। নিম্নোক্ত প্রকারের ইতিহাসের ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রয়োজন।

(১) জাতির সেই ইতিহাস যা তার পরিচয় হিসাবে পরিগণিত হয়। (২) ঐ সকল ঐতিহাসিক ঘটনার জ্ঞান যা কোনো বড় বিরোধের কারণে পরিণত হয়েছে। (৩) সেই ইতিহাস যা জাতির ঐতিহ্যের অন্তভুক্ত হয়ে রয়েছে।

❖ *(২) সমাজের সকল স্তরের লোকজন এবং দলসমূহ*

গোরিলা যুদ্ধের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান যা অর্জন করা আবশ্যক তা হলো সমাজিক জ্ঞান এবং সেই সমাজের বিভক্তি অথবা সমাজের বিভিন্ন স্তরের ইল্‌ম। সমাজিক ইল্‌ম গোরিলাদেরকে সমাজের সকল স্তরের লোক ও দলসমূহকে বুঝার সাহায্য করে। সমাজিক ইল্‌ম গোরিলাদেরকে আরো জানতে সাহায্য করে যে, সমাজের সকল স্তরের মাঝে বিরোধ ও সমস্যসমূহের উৎস কোথায়। এ ছাড়া এটাও গোরিলাদের জ্ঞানে আসে যে, সমাজে উপস্থিত সকল স্তরের লোক ও দলসমূহের মধ্যে নিজেদের জন্য সুযোগ সুবিধার সম্ভবনা ও বিপদ আপদের আশঙ্কা

কোথায়। সমাজিক ইল্‌ম এর প্রয়োজন এই জন্যও হয়ে থাকে যে, এর দ্বারা গোরিলারা স্বীয় বন্ধু এবং শত্রুদেরকে সহজেই সনাক্ত/ চিহ্নিত করতে পারে। সমাজ যে ধরনেরই হোক না কেন তাতে বসবাসকারী লোকদেরকে দই স্তরে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) সমাজে পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গদের স্তর (২) সমাজের বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাশীল লোকদের স্তর।

❖ *সমাজে পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গদের স্তর*

মর্যাদার দিক দিয়ে সমাজের লোকদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ সেই সকল প্রভাবশালী লোক যারা সমাজে নেতৃত্ব করে। সমাজের রাজনৈতিক এবং সরকারী ব্যবস্থাপনা সংগঠিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সমাজ তাদেরকে প্রভাবশালী বলে আখ্যায়িত করে। দ্বিতীয় স্তরের লোক যারা সমাজকে জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করতে সাহায্য করে। এ ভাবে পদমর্যাদার দিক দিয়ে সমাজকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। (১) সমাজের প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী লোকদের স্তর (২) সমাজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানকারী লোকদের স্তর।

❖ *সমাজের প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী লোকদের স্তর*

প্রত্যেক সমাজে এমন প্রভাবশালী লোকদের এক স্তর উপস্থিত থাকে যারা সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোকদের উৎপত্তির ধরণ প্রত্যেক দেশ ও জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ স্তরের লোকদের প্রভাবশালী হওয়ার তিনটি কারণ হয়ে থাকে। প্রথমতঃ তার গোত্র শক্তিশালী হয় অথবা তার নিকট চাষ-আবাদের জমি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তার নিকট গোত্র শক্তিশালী ও প্রচুর জমি উভয় রয়েছে। তৃতীয়তঃ সমাজের লোককে যে জিনিষটি প্রভাবশালীদের গন্ডিতে প্রবেশ করাতে সাহায্য করে তা হলো ইল্‌ম বা জ্ঞান। এভাবে প্রভাবশালীদের উৎপত্তির উৎস নিম্নোক্ত তিনটি যথা গোত্র, জমি ও ইল্‌ম বা জ্ঞান। এ স্তরের মধ্যে নিম্ন প্রকারের লোকদেরকে সংযুক্ত করা যায়। যেমনঃ রাজ বংশীয় ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক বংশধর, সরদার বা মোড়ল, সৈনিকদের উচ্চপদস্ত অফিসার, জমিদার ও সকল স্তরের ওলামায়ে কিরাম। এই স্তরের লোকদের মৌলিক কাজ হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে প্রতিষ্ঠা করা এবং তার নেতৃত্ব করা।

❖ *(২) সমাজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানকারী লোকদের স্তর।*

সমাজের দ্বিতীয় স্তরের লোক যারা সমাজের চাহিদা মিটায়। এদরে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ঐ সকল কারিগর, শিল্পী ও নির্মাতা যারা কল-কারখানায়, চাষ-আবাদে ও বাজারে কাজ করে। এই স্তরের লোকদেরকেও তিন ধরণের স্তরে ভাগ করা যায়। যেমনঃ ব্যবসায়ীক এবং কারিগর ও নির্মাতাদের স্তর, শ্রমিক ও কৃষকদের স্তর এবং নিম্নশ্রেণীদের স্তর।

❖ *(২) সমাজের বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাশীল লোকদের স্তর।*

আদম (আঃ) এর সৃষ্টি হতে নিয়ে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত মানব সমাজ এবং তার সকল স্তরের লোকদের পথপদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়ালা যোগে যোগে অনেক নবী ও রসূলগণ (আঃ) এবং তাদের সাথে স্বীয় কিতাবসমূহ বা গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেন। প্রেরিত এই নবী ও রসূলগণ (আঃ) সমাজের পথপদর্শন করেন। কিন্তু উক্ত সমাজে এমন কিছু সংখ্যক লোকের সৃষ্টি হয় যারা নবী ও রসূলগণ (আঃ) এর মোকাবেলায় মানব সমাজের সকল স্তরের লোকদের সমস্যার সমাধান স্বীয় বিবেকের দ্বারা দিতে আরম্ভ করে এবং মানব সমাজকে এভাবে পথভ্রষ্ট করে। এখান থেকে নবী ও রসূলগণ (আঃ) এর নিয়ে আসা দ্বীন এবং মানুষের বিবেক এর উৎপত্তি চিন্তাধারার ভিত্তিতে

মানব সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়। (১) আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশা রেখে আমলকারীদের দল। (২) আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশা না রেখে আমলকারী লোকদের দল।

(১) আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশা রেখে আমলকারীদের দল

আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশা রেখে আমলকারীরা আল্লাহ, কিয়ামত দিবস এবং জান্নাত ও দোযখ এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু প্রত্যেক দল যারা আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশা নিয়ে আমল করে থাকে তাদের মধ্যেও এ আক্বীদা বিশ্বাস একে অপর হতে ভিন্ন হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত দলসমূহ এদলের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

মুসলিমঃ মানব সমাজের মাঝে মুসলিম তারাই যারা সত্য দ্বীন তথা ইসলাম এবং আল্লাহর শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার শেষ গ্রন্থ আল-কোরআনকে অনুসরণ করে। হযরত উছমান (রাঃ) এর শাহাদাতের পর শিয়া, খারেজী, মু'তাযিলা, মর্‌জীয়া, কদ্‌রীয়া এবং জাহ্‌মীয়া ইত্যাদি নামে অনেক পথভ্রষ্ট দলের উৎপত্তি হতে শুরু করে। এভাবে মুসলিমদের মধ্যে "আহ্‌লে সুন্নাত" এবং "পথভ্রষ্টদল" উভয়ের জন্ম হয়। এই সমস্ত"পথভ্রষ্টদল" সমূহের মধ্যে অনেক গোমরা ফির্‌কাকে ওলামায়ে কিরাম কাফের হিসাবে অভিহিতও করেছেন।

খৃষ্ট্রানঃযারা এক আল্লাহকে (আমরা আল্লাহর আশ্রয় পার্থনা করি) তিন অংশে বিভক্ত করে নিয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করেছে এবং তাকে মানবতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিবারক হিসাবে অভিহিত করেছে। খৃষ্ট্রানদের মধ্যে অনেক ফির্‌কা রয়েছে তন্মধ্যে **"কিথোলিক"**, **"প্রোটেষ্টেন্ড"** এবং **"প্রচলিত পুরাতন গির্জার ধারক বাহক দল"** বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

ইহুদীঃযারা "হযরত ঈসা (আঃ)" এবং "ইন্‌জীল" কে অস্বীকার করেছে এবং এর পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তারা আল্লাহর গ্রন্থে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে, "তাল্‌মোদ" কে ওহী প্রদত্ত ইল্‌ম হিসাবে আখ্যায়িত করে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

মুশ্‌রিক বা অংশীবাদীদলঃযারা আল্লাহকে তো পালনকর্তা মনে করে এর সাথে সাথে মূর্তিকেও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায় গণ্য করে। এরাও স্বীয় আমলের প্রতিদানের আশা আল্লাহর নিকটই রাখে।

❖ *(২) আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশা না রেখে আমলকারী লোকদের দল।*

আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশা না রেখে আমলকারী লোকদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ যারা মূর্তি, সূর্য এবং অগ্নিকে রব (প্রতিপালক) হিসাবে অভিহিত করে এবং তার নিকট বিনিময়ের আশা করে। দ্বিতীয় দল যারা মানবতার সেবার প্রতি বিশ্বাস রাখে যেমনঃ সমাজতান্ত্রিক দল, গণতান্ত্রিকদল এবং সমাজ সেবায় নিয়োজিত লোক।

❖ *মানব সমাজে উপস্থিত দলসমূহের সারসংক্ষেপ*

সমাজে পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ এবং বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাশীল লোকদের সম্পর্কে অধ্যয়ণের সংক্ষিপ্তসার /সারাংশ হলো এই যে, মানব সমাজ প্রথম থেকেই স্বীয় পদমর্যাদার দিক দিয়ে বিভক্ত হয়ে আসছে এবং তাদের পথপদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়ালা নবীগণ ও স্বীয় গ্রন্থের মাধ্যমে শরীয়ত অবতীর্ণ করেন। কিন্তু মানুষ স্বীয় বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী অন্যান্য চিন্তাধারাকে গ্রহণ করতে আরম্ভ করে এবং ভ্রষ্টপথে নিমজ্জিত হয়। সমাজের বিভিন্ন দলের লোকেরা নিজ নিজ স্বার্থে ওহী প্রদত্ত ইল্‌ম ব্যতীত অন্যান্য চিন্তাধারাকে গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। যে চিন্তাধারা প্রভাবশালীদেরকে লাভবান করতো তারা সেটাকেই গ্রহণ করতো কিন্তু এ চিন্তাধারা অন্যান্যদের স্বার্থের বিরোধী ছিলো তাই তারা তার বিরোধীতা শুরু করতো এবং নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার জন্য অন্য চিন্তাধারাকে গ্রহন করতো যা তাদেরকে লাভবান করতো। এভাবে একদিকে তারা আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তকে প্রত্যাখান করে এবং অপরদিকে এ স্তরের লোকেরা একে অপরের সাথে দন্দে লিপ্ত হয়। এভাবে দলীয় বিরোধ ও কোন্দলের কারণে মানব সমাজ বিশৃঙ্খলায় আবর্তিত / পরিণত হয়। (সমাজে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়।)

বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত মানবদলের প্রকারভেদ এর সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

(১)আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশা রেখে আমলকারী লোকদের দল। যেমনঃ ইহুদ, খৃষ্ট্রান, মুশরিক এবং মুসলিমদের মধ্যে গোমরা বা বিভ্রান্তকর দল।

(২) আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশা না রেখে আমলকারী লোকদেরদল।যেমনঃ মুশরিক, অগ্নিপুজক, বেদ্বীন, পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক।

❖ দেশের শাসন ব্যবস্থা

গোরিলা যুদ্ধ সর্ম্পকে সমাজিক অধ্যয়নের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান বা ইল্ম যা মুজাহিদীনদের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক তা হলো যে কোনো সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোর জ্ঞান বা ইল্ম। গোরিলা যুদ্ধের সব চাইতে বড় লক্ষ্যবস্তু হলো যে কোনো সরকারী শাসন ব্যবস্থাকে বিলিন / নস্যাৎ করে তার স্থলে নতুন শাসন ব্যবস্থা গঠন করা। যে কোনো স্থানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা কাঠামো সেখানকার লোকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারী শাসন ব্যবস্থার অধ্যয়নের জন্য নিম্নোক্ত বস্তুর জ্ঞান রাখা জরুরী। যেমনঃ এ শাসন ব্যবস্থার মৌলিক অংশ কতগুলো এবং তা কি কি? এ শাসন ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করছে? এ শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মতো এবং তার হিফাযত করার মতো প্রতিষ্ঠান কোনটি বলবৎ রয়েছে?।

(১)শাসন ব্যবস্থার মৌলিক অংশ (২) শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা পদ্ধতি (৩) শাসন ব্যবস্থার সহায়ক এবং হিফাযতকারী প্রতিষ্ঠান

(১)শাসন ব্যবস্থার মৌলিক অংশ

সাম্প্রকি কালে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ শাসন ব্যবস্থার কাঠামোতে রয়েছে জাতীয় সংসদ, প্রাদেশিক সংসদ এবং জিলাভিত্তিক জিলা পরিচালকের কার্যলয়। জাতীয় সংসদ স্বীয় বিধি-বিধান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কার্যকরি করে। মন্ত্রিপরিষদ তাদের তৈয়ারকৃত আইন নিজেদের কার্যলয়ের মাধ্যমে কার্যকরি করে যা সরকারী কর্মকর্তাগণ সাধারণতঃ পরিচালনা করে থাকে। এ শাসন ব্যবস্থার তৃতীয় স্তম্ভ হলো রাজনৈতিক দল যারা নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদভবনে পৌঁছে / এসে পাড়িজমায় / সমাসিন হয়।

গণতান্ত্রিত ভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নিম্নোক্ত তিনটি কার্যকরি কাঠামো বলবৎ থাকে। (১) শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা কাঠামো বা প্রতিষ্ঠান (২) প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক (bureaucracy আমলাতন্ত্র বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা) (৩) রাজনৈতিক দলসমূহ।

এ তিনটি কাঠামোকে বুঝার জন্য আমাদেরকে নিম্নোলিখিত বিষয়বস্তু সর্ম্পকে অধ্যয়ণ করতে হবে।

(১) প্রশাসনিক কার্যলয় বা প্রতিষ্ঠান কি? (২) আমলাতন্ত্ররা কিভাবে কার্য সম্পাদন করে। (৩) রাজনৈতিক দল কতগুলো তাদের কর্মসূচী কি? (৪) নির্বাচন পদ্ধতি বা কি? (৫) রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার সব চাইতে ছোট্ট সংস্থা কোনটি এবং এ সংস্থা কিভাবে কার্য সম্পাদন করে।

❖ (২) শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা পদ্ধতি

শ্রেষ্টত্বের যুদ্ধ বা কোল্ড ওয়ারে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পতনের পর সারা বিশ্বে প্রায় পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ শাসন ব্যবস্থার শ্লোগান স্বাধীনতা, সাম্যবাদ এবং প্রগতি। গণতন্ত্র নারী-পুরুষকে সমান অধিকার দেয়ার দাবী করে। এই জন্য গণতন্ত্র সবাইকে এক সমান মনে করে। গণতন্ত্র মুখি শাসন ব্যবস্থা আইন প্রণয়ন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও প্রশাসনিক বিভাগ নিয়ে গঠিত হয়। যে কোনো শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ দিক এটাই যে, এ শাসন ব্যবস্থাতে কেন্দ্রকে প্রদেশ এবং জিলার সাথে কিভাবে সংযুক্ত করা হয় কেননা জিলা এমন একটি সরকারী প্রাণকেন্দ্র যেখান থেকে সরকারী বিধি-নিষেধ এবং সরকারী সুযোগ-সুবিধা জনগণের নিকট পৌছানো হয়। এভাবে জিলা জনসাধারণ এবং সরকারের মাঝে সেতুর কাজ দেয়। যখন এ শাসন ব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজকে স্বীয় আওতায় নিয়ে আসে তখন একে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ, আই এম এফ এবং বিশ্ব বাণিজ্য ব্যাংক এর সাথে জড়িত হয়। যে কোনো শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা পদ্ধতিকে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সর্ম্পকে ওয়াকিফহাল হতে হবে। (১) শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার গঠনপ্রণালীর উদ্দেশ্য কি? (২) এ শাসন ব্যবস্থা ব্যক্তিকে কোন দৃষ্টিতে বিবেচনা করে যার অন্তর্ভূক্ত নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা এবং সুস্থ-অসুস্থ ইত্যাদি সবই রয়েছে। (৩) এ শাসন ব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজকে কিভাবে নিজের সাথে জড়িত করে। (৪) এ শাসন ব্যবস্থার সব চাইতে ছোট্ট প্রশাসনিক বিভাগ কোনটি? (৫) এ শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্র এবং প্রদেশকে স্বীয় সব চাইকে ছোট্ট অর্থাৎ জিলার সাথে কিভাবে যোগাযোগ রাখে? (৬) এ শাসন ব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজ এবং নিজেকে কিভাবে আন্তর্জাতিক প্রশাসনের সাথে জড়িত করে?

❖ *এ শাসন ব্যবস্থার সহায়ক এবং হিফাযতকারী প্রতিষ্ঠান*

যে কোনো শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলার মতো প্রতিষ্ঠান তিনপ্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ তার হিফাযতকারী প্রতিষ্ঠান, দ্বিতীয় ধরনের প্রতিষ্ঠান তার অর্থ যোগায় এবং তৃতীয় ধরনের প্রতিষ্ঠান যাকে তেজস্কর করে তুলার জন্য শক্তি প্রদান করে।

❖ শাসন ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানঃ

প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাই শাসন ব্যবস্থার রক্ষকের কাজ করে থাকে। এ সংস্থাই শাসন ব্যবস্থার ভিতরগত এবং বহিরাগত আপদ-বিপদ হতে রক্ষা করে। কতগুলো প্রতিষ্ঠান এমনও থাকে যার কাজ হলো দেশের মধ্যে দেশের আইন বলবৎ রাখার নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা করা এবং আইনের

বিরোধীতা করা হতে জনগণকে বিরত রাখা। এ ব্যাপারে দেশের ভিতর দুই ব্যক্তি অথবা দুই দলের মাঝে যে সমস্যা দেখা দেয় তা দেশের আইনের দ্বারা সমাধান করা হয়। আরেক ধরনের প্রতিষ্ঠান এমন থাকে যাদের কাজ হলো শাসন ব্যবস্থার প্রতি কোনো ব্যক্তি বা দলের পক্ষ হতে ভিতরগত হামলা বা বিদ্রোহ হয় তা থেকে নিরাপদ করা। এমনিভাবে এ সংস্থাসমূহ দেশের বাহিরের আপদ-বিপদ হতেও রক্ষা করে।

প্রধান গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রতিষ্ঠাকারী সংস্থা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃপুলিশ, আধা সরকারী সৈন্যবাহিনী, সৈন্যবাহিনী, গোয়েন্দাবাহিনী

❖ শাসন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান

এ প্রতিষ্ঠান দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য অর্থ প্রদান করে থাকে। এ অর্থ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বানিজ্য, জনগণের ওপর আরোপিত টেক্স এবং ব্যাংক এর মাধ্যমে অর্জন করা হয়। শাসন ব্যবস্থাকে আর্থিক সাহায্য প্রদানকারী প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

(১) আন্তর্জাতিক ব্যাংক (২) আভ্যন্তরিন ব্যাংক (৩) বাণিজ্য (৪) টেক্স প্রশাসন বিভাগ।

❖ শাসন ব্যবস্থাকে শক্তি এবং সরঞ্জাম প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ ও যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করে।

(১) শিল্প সংস্থ (২) কৃষি বিভাগ (৩) ঘনিজ (৪) বাণিজ্য বিভাগ (৫) পানি ও বিদ্যুত সরবরাহকারী সংস্থা (৬) যোগাযোগ সংস্থা (৭) ট্র্যান্সপোর্ট বা পরিবহন সংস্থা

❖ গোরিলাদের যোগ্যতা

গোরিলাদের যোগ্যতার অর্থ হলো এই যে, সমাজের সমস্ত দিক অর্থাৎ দেশ ও সমাজের ইতিহাস, সমাজের সকল স্তর এবং দলসমূহের জ্ঞান বা ইল্‌ম, দেশের শাসন ব্যবস্থার জ্ঞান অর্জন করার পর গোরিলাদেরকে দেখতে হবে যে, তারা স্বীয় আদর্শকে ভিত্তি করে কোনো আন্দোলন চালানোর যোগ্যতা রাখে অথবা রাখেনা এবং আন্দোলনের সূচনা করার পর সফলতার কতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে। তাদেরকে এটাও দেখতে হবে যে, গোরিলারা সমাজের সকল স্তরের লোকদের মধ্যে কতটুকু প্রভাব রাখে এবং তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদেরকে স্বীয় সমর্থনে আন্দোলিত করার যোগ্যতা রাখে। তাদেরকে এটাও দেখতে হবে যে, তাদের মধ্যে শাসন ব্যবস্থার পতনের সাথে সাথে নতুন শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের যোগ্যতা বর্তমান রয়েছে কি না। কেননা অন্যথায় দেশ দীর্ঘ ঘরোয়া যুদ্ধে পরিণত হয়ে পড়বে। গোরিলাদের যোগ্যতার সঠিক বিশ্লেষণ এই জন্য প্রয়োজন কেননা বিশ্লেষণ করা ব্যতীত যুদ্ধের সূচনা করাতে অনেক বেশি সময়, জনশক্তি এবং অর্থ-সম্পদ এর অপচয় ও ক্ষতি হতে পারে। গোরিলাদের যোগ্যতার সঠিক বিশ্লেষণ তাদের সশস্ত্র শক্তিকে বিচার বিবেচনা করার যোগ্য করে তুলে যে, যুদ্ধ কোন ক্ষেত্রে করা সমীচীন আর কোন ক্ষেত্রে সমীচীন নয় এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিভাবে সশস্ত্র শক্তিকে সংগঠিত ও সুবিন্যস্ত করতে হবে।

❖ গোরিলা এবং সমাজেরসাথে তাদের সর্ম্পক

পূর্বের সমস্ত আলোচনা থেকে এ কথাটি স্পষ্ট উঠেছে যে, গোরিলা যুদ্ধের জন্য সমাজের গুরুত্ব কতটুকু। গোরিলা যুদ্ধের সফলতার জন্য আবশ্যক এই যে, গোরিলারা সমাজের শক্তিসমূহকে নিজেদের স্বার্থে পাল্টে নেয়। গোরিলা যুদ্ধের ফলে সমাজে এক ধরনের তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। গোরিলা যেভাবে সমাজকে নিজেদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ঠিক তেমনিভাবে তাদের শত্রুরাও এ কথাটি ভালভাবে বুঝে। এর ফলে সমাজ যুদ্ধ ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। প্রচলিত সংগঠিত সৈন্যদের যুদ্ধের মোকাবেলায় গোরিলা যুদ্ধের আকারে সমাজ অনেক ভূমিকা পালন করে। যে ভাবে গোরিলারা সমাজে নিজেদের সমর্থক বানানোর চেষ্টা করে ঠিক তেমনিভাবে তাদের বিরোধী শক্তিদেরও এই চেষ্টাই হয়। যার ফলে সমাজ গোরিলাদের জন্য সমর্থক, বিরোধী এবং নিরপেক্ষ দলে বিভক্ত হয়। এ পরিস্থিতিতে গোরিলাদেরকে সমাজের এই নব জন্ম নেয়া লোকদের স্তর (যা যুদ্ধের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে) এবং সমাজে প্রথম থেকেই উপস্থিত প্রকৃত লোকদের স্তর সম্পর্কে অনেক বিচার বিবেচনা করতে হয় । কেননা যুদ্ধের প্রাক্কালে এই সকল স্তরের লোকদের সাথে

অগণিত সমস্যা জড়িত হয়। গোরিলাদেরকে সমাজের এই স্তরের লোকদের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে দৃষ্টি রাখতে হয়। যেমনঃ

(১) সমাজে গোরিলাদের বন্ধু ও শত্রু কে বা কারা তার যাচাই বাছাই,

(২) বন্ধু ও শত্রু নির্ধারণের ক্ষমতা এবং পদ্ধতি,

(৩) বন্ধু ও শত্রুদের প্রকারভেদ,

(৪) মুজাহিদ গোরিলা সশস্ত্রদের সাধারণ বন্ধু ও শত্রুদের নির্ণয়।

❖ সমাজে গোরিলাদের বন্ধু ও শত্রু

যখন কোনো বেদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গোরিলা যুদ্ধ শুরু করা হয় তখন গোরিলাদের দোস্ত ও দুশমনদেরকে নির্ধারণ অনেক সহজ হয়ে যায়। অন্যথায় যখন দেশের আভ্যন্তরিন গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার কারণে স্বীয় দ্বীনত্যাগী মুরতাদ ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে গোরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করা হয় তখন সমাজে উপস্থিত শত্রু ও বন্ধুদের পরিচয় করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যদি এ যুদ্ধে দোস্ত ও দুশমনদের ঠিক ঠিক চিহ্নিত করা সম্ভব হয় তা'হলে গোরিলাদেরকে সংগঠিত এবং লক্ষ্যবস্তু নির্বাচন করতে অনেক সহজ হয়ে যায়। দোস্ত ও দুশমনদের সঠিক চিহ্নিত করার জন্য আমাদের উক্ত এলাকা এবং দেশের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। এ জ্ঞান ব্যতীত ভিতরগত স্বীয় শত্রুদের নির্ণয়আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। সাধারণতঃ দেখা গেছে যে, কখনো আমরা এক ব্যক্তিকে আমাদের শত্রু বলে ভেবে নিয়েছি অথচ সে প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকারী এবং জিহাদের সমর্থক হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যাদেরকে আমরা দোস্ত মনে করতাম সে মুজাহিদদের কঠিন ক্ষতি সাধন করেছে। উপরোক্ত দু'টি দিকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক যা নির্ভর করে মুজাহিদীনদের সাথে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সম্পর্কের ধরন কিরূপ তার সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়ার ওপর। এ ওয়াকেফহাল হওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটি ও অবহেলা উভয়ই মুজাহিদদের জন্য ক্ষতিকর। সমাজের সকল স্তরের লোকদেরকে শত্রু হিসাবে পরিগণিত করে তাদের সাথে একই রকমের আচার আচরণও মুজাহিদীন তথা সশস্ত্র শক্তিদের নীতির জন্য ক্ষতিকর হিসাবে পরিণত হচ্ছে এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে সক্রিয় শত্রুদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পরিণত হচ্ছে। এমনিভাবে প্রকৃত দুশমন এবং সক্রিয় শত্রুদের মধ্যেও পার্থক্য করা আবশ্যক। এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগত দোস্ত ও দুশমন এর প্রকারভেদ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা হবে ইন্‌শা-আল্লাহ। ৬৭

❖ গোরিলা যুদ্ধ এবং দাওয়াতী শাখা

দাওয়াতী শাখার পবর্তন গোরিলা যুদ্ধের সূচনার জন্য সর্ব প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পরিগণিত হয়। এ দাওয়াতী শাখাই সমাজ জীবনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, আমাদের শত্রু আমাদের আক্বীদা বিশ্বাস এবং আমাদের দেশ আমাদের থেকে ছিনিয়ে আমাদেরকে দাসত্বে পরিণত করকে চায়। এই দাওয়াতই গোরিলা শক্তিকে একত্রিত করে এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধের চেতনা সৃষ্টি করে। দাওয়াত বিভাগই

জনগণের সম্মুখে স্বীয় আদর্শ ও কর্মসূচী রাখে যা জনগণ কখনো গ্রহন করে আবার কখনো নাকচ করে। এই দাওয়াতের ফলে জনগণ গোরিলা শক্তিতে যোগদান করে।

দাওয়াতকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়

- দাওয়াতের ধরন হিসাবে দাওয়াতের প্রকারভেদ
- পদক্ষেপ নেয়ার দিক দিয়ে দাওয়াতের প্রকারভেদ
- সমাজের স্তরের দিক দিয়ে দাওয়াতের প্রকারভেদ

❖ দাওয়াতের ধরন হিসাবে দাওয়াতের প্রকারভেদ

দাওয়াতের ধরন হিসাবে দাওয়াত আবার দুই প্রকার যেমনঃ

- সাধারণ দাওয়াত।
- অসাধারণ বা বিশেষ দাওয়াত।

❖ সাধারণ দাওয়াত

সাধারণ দাওয়াত সেই দাওয়াতকে বলা হয় যা প্রত্যেক লোকদের জন্য একই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন মুসলিম সমাজে দ্বীনের দাওয়াত, সঠিক আক্বীদার দাওয়াত, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে দাওয়াত এবং কুফুরী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাওয়াত ইত্যাদি। এই দাওয়াতের উদ্দেশ্য সমাজ জীবনকে স্বীয় আক্বীদা ও আচার আচরণের সাথে জড়িত করা। এই দাওয়াতের উপকার এটাও হয়ে থাকে যে, গোরিলা শক্তি সম্পর্কে সমাজে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, গোরিলা শক্তি সমাজের বাহিরের নয় বরং তারা সমাজের স্বীয় আক্বীদা বিশ্বাস এবং সামাজিক রীতিনীতি সাথে জড়িত নিজেদেরই লোক। এই দাওয়াতই সমাজে গোরিলাদের পরিচয় হয়ে থাকে।

❖ অসাধারণ বা বিশেষ দাওয়াত

বিশেষ দাওয়াত সাধারণতঃ সেই দাওয়াতকে বলা হয় যা গোরিলাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত লোকদের প্রশিক্ষণের জন্য দেয়া হয়। অথবা গোরিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য তাদের পাঠ্যসূচীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিংবা কোনো বিশেষ বিষয়বস্তুতে পারদর্শী অর্জনের জন্য দেয়া হয়ে থাকে। এই দাওয়াত পরিস্থিতি অনুযায়ী গোরিলা শক্তিদের সাথে জড়িত লোকদের চিন্তাধারাকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য এবং শত্রুদের পক্ষ হতে প্রচারিত বিভিন্ন ধরনের ভূল-ভ্রান্তি নিরসনের জন্য দেয়া হয়। এমনিভাবে এই দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সেই সকল বিশেষ বিষয়স্তুর প্রশিক্ষণ যার ভিত্তিতে কোনো আন্দোলনকে পরিচালনা করা সম্ভব হয়। বিভাগীয় প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ দাওয়াতের প্রয়োজন হয়ে থাকে। যদিও এই দাওয়াত প্রশিক্ষণের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হয় তবুও যখন গোরিলা শক্তি পৃথক এবং ছত্রভঙ্গ হয় তখন গোরিলাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য লড়াইরত ব্যক্তিবর্গ অথবা দলসমূহকে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ এক দাওয়াতের আকারে দেয়া হয়।

❖ পদক্ষেপ নেয়ার দিক দিয়ে দাওয়াতের প্রকারভেদ

পদক্ষেপ নেয়ার দিক দিয়ে দাওয়াত দুই প্রকার যেমনঃ

- পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আক্বদামী দাওয়াত।
- আত্মরক্ষরার জন্য দিফায়ী দাওয়াত।

❖ আক্বদামী দাওয়াত

আক্বদামী দাওয়াত আবার দুই প্রকার যথা (১) ইতিবাচক (২) নেতিবাচক

ইতিবাচক দাওয়াতের অর্থ হলো এই যে, গোরিলা শক্তির স্বীয় আদর্শ ও চিন্তাধারা প্রচার ও প্রসার। এই দাওয়াতের মাধ্যমে গোরিলাদের অভিমত ও কর্মপদ্ধতি সমাজের সামনে উপস্থাপন করা হয়। আক্বদামী দাওয়াতের নেতিবাচক অংশে শত্রুদের দাওয়াত, তাদের চিন্তাধারা এবং তাদের শাসন ব্যবস্থাকে প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়। শত্রুদের শাসন ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র দেশ ও জাতির শত্রু

হিসাবে আখ্যায়ীত করা হয় না বরং দেশ ও জাতির ওপর চেপে বসা শাসক গোষ্ঠীর উপস্থিতিই সকল বিপদ আপদের জন্য দায়ী হিসাবে আখ্যায়ীত করা হয়।

❖ দিফায়ী দাওয়াত

দিফায়ী দাওয়াতের অর্থ হলো এই যে, গোরিলা শক্তিরা তাদের পদক্ষেপ ও আদর্শ সম্পর্কে শত্রুদের প্রচারিত সংশয়ের প্রতিবাদে স্বীয় অভিমত সহজ ও সরল ভাবে ব্যক্ত করে। গোরিলারা স্বীয় আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাপারে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজের অভিমত গ্রহন করে। দিফায়ী দাওয়াতে অনেক দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ার প্রয়োজন হয়। এ ব্যাপারে শত্রুদের তৎপরতা সম্পর্কে সংবাদ রাখা এবং তদনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরী।

❖ সমাজের স্তরের দিক দিয়ে দাওয়াতের প্রকারভেদ

সমাজে দাওয়াত দিতে গিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। প্রত্যেক সমাজ প্রাকৃতিকভাবে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু দাওয়াতের দিক দিয়ে সমাজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। চতুর্থ স্তর গোরিলা মুজাহিদ এবং সমর্থকরা নিজেরাই হয়ে থাকে। গোরিলাদের দাওয়াতের শ্রোতা সমাজের তিনটি স্তর হয়ে থাকে। দাওয়াতী কাজ গোরিলারা এবং তাদের সমর্থকরা করে। এভাবে দাওয়াতের দিক দিয়ে সমাজ নিম্নবর্তী চার স্তরে বিভক্ত হয়ে থাকে। যথা

- সমর্থক।
- অচেতন সমর্থক।
- বিরোধী।
- পথভ্রষ্ট বিরোধী

❖ সমর্থক

এই স্তরের লোকেরা গোরিলাদের দাওয়াতের সাথে একমত হয়ে থাকে। এই স্তরের লোকদের কাজ সমাজে গোরিলাদের দাওয়াত সাধারণ মানুষের নিকট পৌছানো কেনোনা এই স্তরের লোকেরা বিরোধীদের সম্মুখিন হয় এই জন্য বিরোধীদের পশ্নের

উত্তর দেয়া এবং তাদের সংশয় নিরসনের জন্য এই স্তরের লোকদেরকে বিশেষভাবে দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। এদের সমর্থনকে ভিত্তি করে গোরিলা নেতাদেরকে এই স্তরের লোকদের প্রশিক্ষণ ও দাওয়াতের দায়িত্ব হতে এক মুহূর্তের জন্য অচেতন হওয়া ঠিক নয়। কেনোনা এরাও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শত্রুদের অপপ্রচারের পাত্র হতে পারে।

❖ অচেতন সমর্থক

সমাজে দাওয়াতের শ্রোতাদের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্তর এরাই। এই স্তরের লোকেরা প্রথম থেকেই শত্রুদের মতাদর্শ এবং তাদের শাসন ব্যবস্থা সম্পকে অবগত। এরা শত্রুদের থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রত্যক্ষভাবে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রথমেই প্রস্তুত ছিলো কিন্তু তাদের সম্মুখে কোনো পথ না থাকায় তারা পথ প্রদর্শকের অপেক্ষা করছিলো। দেশের উচ্ছৃঙ্খলার কারণে এই স্তরের লোকেরা কারোর প্রতি নির্ভর করতে সম্মত ছিলো না এবং গোরিলাদের দাওয়াত হয়তো বা তাদের নিকট পৌছেনি অথবা এযাবৎ তাদের সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহে তারা নিমজ্জিত ছিলো। মূলতঃ গোরিলাদের জন্য এই স্তরের লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া সব চাইতে গুরুত্ববহ এবং সব চাইতে সহজ। যদি গোরিলাদের দাওয়াত সঠিকভাবে এই স্তরের লোকদের নিকট পৌছানো যায় তাহলে অতি সহজে তাদেরকে সমর্থক হিসাবে পরিগণিত করা যেতে পারে। এই স্তরের লোকদেরকে দাওয়াত দিতে গিয়ে এ কথা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, দাওয়াতের ব্যাপারে তাদেরকে আপনজন মনে করতে হবে। বিরোধী এবং এই অচেতনদের মাঝে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতিতে পার্থক্য করতে হবে।

❖ পথভ্রষ্ট বিরোধী

এই স্তরের লোক সমাজে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। বিধায় কোনো বড়ো ধরনের আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য এই স্তরের লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া আবশ্যক। এই স্তরের লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া একটু কঠিন। এদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতাই

গোরিলাদের সাথে বিরোধীর মূল কারণ। এরা সমাজে ছড়িয়ে থাকা অথবা শত্রুদের প্রচারিত ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে মতাদর্শী হয়েছে এবং এরই মাঝে নিজেদের ও জাতির পরিত্রাণ দেখতে আরম্ভ করেছে। এরা দেশ ও দশের পরিস্থিতিতে দুঃখিত হয় বটে কিন্তু এই পরিস্থিতির নিরসন সেই বাতিল আদর্শের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দেখে যা দেশ ও জাতির শত্রুরা একটি মিথ্যা কর্মসূচী হিসাবে জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করে রেখেছে। এরই কারণে এরা গোরিলা আন্দোলনকে দেশ ও জাতির সমস্যার মাঝে আরো একটি সমস্যা এবং দেশ ও জাতির উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা মনে করে। এরা স্বীয় বিশেষ চিন্তাধারা রাখার কারণে গোরিলা আন্দোলনে নিজেদের জন্য কোনো আকর্ষণ দেখতে পায় না বরং এর বিপরীত গোরিলা আন্দোলনকে বিপদজনক, নিজেদের চিন্তাধারার সাথে সাংঘর্ষিক এবং নিজেদের শত্রু হিসাবে ধারণা করে। এই স্তরের লোকেরা ভিতরগতভাবে দুই স্তরে বিভক্ত হয়ে থাকে। প্রথম স্তরের লোক যারা সেই চিন্তাধারাকেই (যা দেশে প্রচলিত রয়েছে) নিজেদের উদ্দেশ্য ও নিজেদের ঈমান মনে করে এবং এই চিন্তাধারা ব্যতীত অন্যান্য চিন্তাধারাকে বাতিল হিসাবে আখ্যায়ীত করে। এরা মূলতঃ গোরিলা শক্তি এবং তাদের চিন্তাচেতনাকে প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রে অযোগ্য মনে করে। দ্বিতীয় স্তরের লোক যারা প্রচলিত চিন্তাধারাকে শুধুমাত্র দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য একটি মাধ্যম হিসাবে গ্রহন করে নিয়েছে। এই স্তরের লোকদের সেই চিন্তাধারার সাথে (যা দেশে প্রচলিত রয়েছে) কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে আর না গোরিলাদের সাথে কোনো বিশেষ বিরূপভাব কিন্তু তারা তাদের বর্তমান চিন্তাধারাকেই কর্মক্ষেত্রের জন্য যোগ্য ও লাভজনক মনে করে মাত্র।

এই ধরনের লোকদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের মাধ্যম অবলম্বন করতে হয়। এর জন্য প্রচলিত চিন্তাধারাকে প্রমাণাদির দ্বারা খন্ডন করতে হয় যা তারা ধারণ করে রেখেছে। কখনো কখনো গোরিলাদেরকে সত্যের ধারক বাহক হিসাবে প্রমাণ পুঞ্জির দ্বারা পরিস্ফুটিত করতে হয় এবং তাদেরকে সমাজ সংস্কারক হিসাবে উপস্থাপন করতে হয়।

এর জন্য কখনো কখনো তর্কবিতর্ক করতে হয়, কখনো উপদেশদাতা হিসাবে কাজ করতে হয় আবার কখনো সংস্কারক হিসাবে পরিচয় দিতে হয় আবার কখনো হিতাকাঙ্খী হিসাবে।

দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারের সাথে এই স্তরের লোকদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে কেনোনা এই স্তরের লোক সমাজে বেশি বিদ্যমান। এদেরকে দাওয়াত দেয়ার ফল এটাও দৃষ্টিগোচর হয় যে, এই স্তরের ভিতর বিভক্তি দ্রুত পরিস্ফুটিত হতে শুরু করে। এখন যারা বিরোধীতা করে তারা প্রমাণাদির মাধ্যমে বিরোধীতা করে আর যারা সমর্থন করে তারাও চেতনার সাথে সমর্থন করতে শুরু করে। এই ভাবে এক স্তর গোরিলাদের খোলাখোলীভাবে বিরোধীতায় স্থায়ী হয়ে যায় আরেক স্তরের লোকেরা গোরিলাদের নিকটবর্তী হতে থাকে। এই দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা যদি গোরিলাদের দলে যোগদান নাও করে তবুও তাদের গোরিলাদের ক্ষতির সম্ভবনা থাকে না কারণ তারা গোরিলাদের বিরোধীতা করে না। এরা সময় অতিবাহীত হওয়ার সাথে সাথে গোরিলাদের সমর্থকে যোগ দেয়। এই ভাবে সমাজে গোরিলাদের সমর্থক এবং তাদের বিরোধী দলে বিভক্তি হতে দেখা দেয় এবং নিফাক শেষ হয়ে যায়। যার ফলে গোরিলা শক্তির দাওয়াতী শাখার সাথে সাথে তাদের রাজনৈতিক শাখার কাজও সহজতর হয়ে থাকে।

❖ বিরোধী

এরা সচেতন চিন্তাশক্তির অধিকারী তাই গোরিলাদের প্রকৃত শত্রু হিসাবে পরিগণিত হয় এবং সমাজে এরা গোরিলাদের প্রকৃত প্রতিপক্ষ বলে আখ্যায়ীত হয়। এ বিরোধী শক্তি সমাজে বেশি নয় কিন্তু তারা স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদেরকে প্রলোভন, ধোকা অথবা ভয় দেখিয়ে নিজেদের সাথে জড়িত করে নিয়ে থাকে। এদের হয়তো ব্যক্তিগত অথবা দলীয় স্বার্থ দেশের ওপর চেপে বসা শাসক গোষ্ঠীর সাথে জড়িত থাকে অথবা কমপক্ষে গোরিলাদের সফলতায় তাদের স্বার্থ ক্ষতির সম্মুখিন হওয়ার সম্ভবনা হয়। এরা অনেক সময় দেশের শাসকদের সাথে

আদর্শিক সম্পর্ক রাখে তার জন্য সব ধরনের কুরবানী করতে বাধ্য হয়। এদেরকে দাওয়াত শুধুমাত্র হুজ্জাত কায়েম করার জন্য দেয়া হয়। অন্যথায় তাদের মোকাবেলার জন্য রাজনৈতিক ময়দান এবং সশস্ত্র সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হয়।

❖ গোরিলা যুদ্ধের ময়দান

যুদ্ধ যে কোনো প্রকারেরই হোক না কেনো সেটা কোনো না কোনো ভৌগলিক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে বিশেষ করে গোরিলা যুদ্ধ কেনোনা এটা একটা সামাজিক যুদ্ধ এবং সমাজেই এ যুদ্ধ লড়া হয়। বিধায় ঐ ভৌগলিক স্থান যেখানে জন বসতি গড়ে উঠেছে সেখানে যুদ্ধের ময়দান রূপে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধের প্রকৃত ক্ষেত্র অর্থাৎ দাওয়াতী, রাজনৈতিক এবং আসকারী ময়দানের মোকাবেলায় উহাকে প্রাকৃতিক ময়দান বলা যেতে পারা যায়। গোরিলা যুদ্ধ যেহেতু সমাজেই লড়া হয় এই জন্য এতে যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রস্তুতি 'সংগঠিত যুদ্ধ' হতে ভিন্নতর হয়ে থাকে। গোরিলারা স্বীয় সমাজকে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভক্ত করে নেয়। এ বিভক্তিতে বিশেষ এলাকার সামাজিকতা ও তার কাঠামোকে এবং শত্রুদের বিশেষ এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণকে লক্ষ্য রাখা হয়।

গোরিলাদের নিজস্ব সংগঠনের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন হয় যেখান থেকে তারা নিজেদের অভিযানের প্রস্তুতি নিতে পারে। এ কাজের জন্য পূর্ণ ভৌগলিক স্থানের সেই অংশকে নির্ধারণ করা হয় যা শত্রুদের পথে প্রাকৃতিক, ভৌগলিক এবং সামাজিক অথবা রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায়। এ ভাবে সমাজের যে অংশ শত্রুদের দখলে রয়েছে উহাকে অভিযানের জন্য এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সাধারণতঃ উপরোক্ত দু'টি এলাকার মধ্য হতে একটি এলাকাকে অভিযান সংক্রান্ত ঘাঁটি বা যুদ্ধাভিযান ঘাঁটি হিসাবে প্রস্তুত করা হয়। যেখান থেকে অভিযানের এলাকায় অভিযান সংক্রান্ত ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই তিনটি

অঞ্চলকে গোরিলা যুদ্ধের প্রকৃত ময়দান বলা যেতে পারে। তাই গোরিলা যুদ্ধ চলাকালে তিন ধরনের যুদ্ধ ক্ষেত্রের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠে।

প্রথমতঃ মৌলিক ভৌগলিক স্থান যা দ্বন্দ্বের উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এই ধরনের মূল ভৌগলিক স্থানের আভ্যন্তরে ছোট্ট ছোট্ট এলাকাও দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত হতে পারে এবং এ গুলো আবার পৃথক পৃথক সতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। বিধায় মূল ভৌগলিক স্থানের আভ্যন্তরীন ছোট্ট ছোট্ট এলাকাকে সতন্ত্র যুদ্ধের ময়দান বলা যেতে পারে। এমন প্রত্যেক ভৌগলিক স্থানে যুদ্ধ করার জন্য দাওয়াতী, রাজনৈতিক এবং সশস্ত্র এই তিনটি ময়দানে যুদ্ধ করা হয়। যেহেতু গোরিলা যুদ্ধ একটি দুর্বল শক্তির যুদ্ধ তাই গোরিলারা উপস্থিত ভৌগলিক স্থানকে সাধারণতঃ তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে যুদ্ধ করে। এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে এই তিনটি যুদ্ধ ক্ষেত্রের বর্ণনা করা হলো।

গোরিলা যুদ্ধের তিনটি প্রকৃত মযদান যা নিম্নে পদত্ত হলো।

- নিরাপদ আশ্রয় স্থল।
- যুদ্ধাভিযান ঘাঁটি।
- অভিযানের এলাকা।

❖ গোরিলাদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল।

গোরিলা যুদ্ধে গোরিলাদের 'নিরাপদ আশ্রয়স্থল' এমন স্থানে স্থাপিত হয় যেখান থেকে গোরিলারা সরকারের সকল আধিপত্য এবং তাদের সকল আইন কানুন অকেজো করে নিজেদের আধিপত্য পূণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। এই আশ্রয়স্থলে বসে তারা যুদ্ধের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহন করে এবং সেখানে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করে। এই স্থানগুলো সাধারণতঃ অত্যন্ত বিপদগামী অঞ্চলে স্থাপিত হয়। যেমন পাহাড়, পর্বত বন-জঙ্গল অথবা মরুভূমি ইত্যাদি যেখানে প্রচলিত সংগঠিত সেনাবাহিনীর পক্ষে অভিযান চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এই নিরাপদ আশ্রয়স্থল হাসিল করার ব্যাপারে স্থানীয় লোকেরা গোরিলাদের পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা করে। এই জায়গা হতে গোরিলাদেরকে জনগণের সমর্থন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং সশস্ত্র সমর্থন পাওয়া যায়। এ ছাড়া সরকারী ও সরকারী সেনাবাহিনীদের অভিযান হতে আত্মরক্ষা সম্ভব হয়। গোরিলাদের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মকর্তাদের সর্বদাই এই প্রচেষ্টা হয়ে থাকে যে, কোনো না কোনো রকমে গোরিলাদেরকে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে নিরাশ্রয় করা। কেনোনা তারা মনে করে যে. যদি গোরিলাদেরকে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে বঞ্চিত করা যায় তাহলে তাদের অভিযানের দক্ষতা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই গোরিলাদেরকে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

❖ মুজাহিদীন এবং নিরাপদ আশ্রয় স্থলের সংরক্ষণ

নিরাপদ আশ্রয় স্থল সম্পর্কে গোরিলাদের সবচাইতে বড়ো লক্ষ্যস্থল হয় কিভাবে একে সরকারী ষড়যন্ত্র হতে নিরাপদ করা যায়। অপরদিকে সরকারী কর্মকর্তাদের চেষ্টা হয় যে, কিভাবে গোরিলাদেরকে এই নিরাপদ জায়গা হতে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়।

এ ব্যাপারে সরকার তিন ধরনের পরিকল্পণা গ্রহন করে।

প্রথমতঃ রাজনৈতিক পরিকল্পণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকার জনগণের সমর্থন নিজেদের স্বার্থ্যে নেয়ার চেষ্টা করা।

দ্বিতীয়তঃ গোরিলাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বা গোয়েন্দা (Spy) বিভাগ সক্রিয় করা তুলা।

তৃতীয়তঃ সাররিক অভিযানের মাধ্যমে গোরিলাদেরকে উক্ত এলাকা হতে বহিস্কার করা পরিকল্পণা গ্রহন।

সরকারী তৎপরতার মোকাবেলায় গোরিলাদেরকে স্বীয় নিরাপদ আশ্রয় স্থলের আত্মরক্ষা সম্পর্কিত একটি পূণাঙ্গ কর্মসূচী গ্রহন করতে হয় এবং এর সাথে সাথে সরকারী পরিকল্পণার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে কর্মপন্থা গ্রহন করতে হয়।

১) নিরাপদ আশ্রয় স্থলের সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা

২) নিরাপদ আশ্রয় স্থলের রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা

৩) নিরাপদ আশ্রয় স্থলের সশস্ত্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা

❖ নিরাপদ আশ্রয় স্থলের সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা

নিরাপদ আশ্রয় স্থলের সবপ্রথম কাঠামো জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় যারা গোরিলাদেরকে আশ্রয় দেয়। বিধায় এ ব্যাপারে জনগণের মাঝে দাওয়াতী কাজ সংগঠিত করা আবশ্যক হয়ে থাকে। দাওয়াত এমন একটি তৎপরতা যা গোরিলা যুদ্ধের মৌলিক ভিত্তি বলে আখ্যায়ীত করা হয়। এই জন্য নিরাপদ আশ্রয় স্থল জনগণের জন্য অনেক প্রয়োজন। দাওয়াতের মাধ্যমে স্থানীয় লোক গোরিলাদের সশস্ত্র শক্তিতে অংশ নিতে থাকবে। এই তৎপরতার মাধ্যমে সমাজে নিজে নিজেই আত্মরক্ষার একটি বলিষ্ঠ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কাঠামো নিজে নিজেই স্থানীয় নেতা ও সরদারদেরকে গোরিলাদের সমর্থনে বাধ্য করবে।

সরকারের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা এটাই হয়ে থাকে যে, সমাজ গোরিলাদেরকে বহিস্কার করুক অথবা আশ্রয় দিতে অস্বীকার করুক কিন্তু যদি (দাওয়াতী তৎপরতার মাধ্যমে) গোরিলা এবং স্থানীয় লোকদের সম্পর্ক শক্তিশালী হয় তাহলে সরকারের এ পরিকল্পণা ব্যর্থ হয়ে যায়। আর যদি স্থানীয় লোকদের সাথে গোরিলাদের সম্পর্ক দুর্বল হয় তাহলে গোরিলাদের জন্য এ অবস্থা জটিল আকার ধারণ করতে পারে। আর এটাই গোরিলাদের বিরুদ্ধে সরকারের সবচাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে থাকে।

❖ দাওয়াতী কাজের জন্য বিভিন্ন স্থর

১) সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

২) যুবক ও ছাত্র সমাজ।

৩) সাধারণ জনতা।

❖ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এই স্তরের লোকদের মধ্যে মোড়ল, ডাক্তার, ব্যবসায়ীক, সরকারী কর্মচারী, স্কুল শিক্ষক, সাহিত্যিক সবই পরিগণিত হয়। এই স্তরের লোকেরা সমাজে জনমত গড়ে তুলে এবং তাদের মতামতকে পরিবর্তন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই গোরিলাদেরকে এই স্তরের লোকদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিৎ। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট দাওয়াত পৌছানোর উদ্দেশ্য হলো এই যে, গোরিলা যুদ্ধকে এরা একটি বিপদ, শান্তি -শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী এবং সাময়িক কাজ বলে আখ্যায়ীত না করে বরং এটাকে সময়ের প্রকৃত প্রয়োজন এবং জাতির লাভজনক কাজ বলে অভিহিত করে।

❖ শিক্ষাঙ্গনের ছাত্র এবং যুব সমাজ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং সমাজের যুবসমাজ গোরিলাদের আসল শক্তি বলে অভিহিত করা হয়। এই জন্য গোরিলাদেরকে শক্তিশালী করে তুলার জন্য এই স্তরের লোকদেরকে বিশেষভাবে দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন হয়।

❖ সমাজের সাধারণ লোক

গোরিলা যুদ্ধ একটি সামাজিক যুদ্ধ হিসাবে পরিগণিত। এতে সমাজের ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় জনগণের নিকট গোরিলাদের দাওয়াত পৌছানো গোরিলা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

❖ নিরাপদ আশ্রয় স্থলের রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা

নিরাপদ আশ্রয় স্থলকে নিরাপদ করার জন্য গোরিলাদের সবচাইতে বড়ো সফলতা হবে এই যে, তারা স্থানীয় সরদার, রাজনীতিবিদ এবং গ্রামের মোড়লদের মধ্য হতে কতগুলো লোকদেরকে নিজেদের সমর্থকদের অধিনে আনতে সক্ষম। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে শাসকদের পথে জটিল সমস্যা সৃষ্টি করা সম্ভব। শাসকদের চেষ্টা এই হয়ে থাকে যে, তারা স্থানীয় সরদার, রাজনৈতিক নেতা এবং গণ্যমান্য লোকদেরকে নিজেদের সমর্থনের নিয়ে এসে গোরিলাদেরকে বহিস্কার করার জন্য বাধ্য করে। যদি গোরিলারা শাসকদের মোকাবেলায় স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদেরকে নিজেদের সমর্থক করতে সক্ষম হয় এবং শক্তির উৎসে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে

সক্ষম হয় তাহলে এই শক্তি রাজনৈতিকভাবে শাসকদের কার্যকলাপের সামনে এসে দাঁড়ায়। এভাবে সমাজের এ শক্তিসমূহ শাসকদের জন্য অগণিত সমস্যার কারণ হয়। গোরিলাদেরকে তাদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল হতে বহিস্কার করে সেখানে সরাসরি সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা গোরিলা বিরোধী সরকারের পূর্ণ চেষ্টা হয়ে থাকে। এ কাজের জন্য সরকার নিম্নোক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করে। সরকারের এই কর্মপদ্ধতিকে উপলব্ধি করে তার নিরোধ সাধন করা আবশ্যক।

গোরিলা বিরোধ সরকারী কর্মসূচী নিম্নরূপ

১) উন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে স্থানীয় লোকদের সমর্থন অর্জন।
২) গোরিলাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকদের সম্বনয়ে শান্তি বাহিনী বা গোত্রীয় সেনাবাহিনী গঠন।
৩) গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিষ্ঠা।
৪) রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা
৫) গোরিলাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ।

❖ উন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে স্থানীয় লোকদের সমর্থন অর্জন।

সরকারের সবচাইতে বড়ো অস্ত্র স্থানীয় লোকদেরকে বিভিন্ন প্রকারের উন্নতির স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের সমর্থন অর্জন করা। প্রলোভন কয়েক রকমের হয়ে থাকে তন্মধ্যে স্থানীয় এলাকার যুবকদের চাকরীতে নিয়োগ করা, সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা, এলাকায় সড়ক নির্মান সহ বিদ্যুত সরবরাহ করা, এ সব কাজ সম্পাদন করার জন্য স্থানীয় লোকদেরকে কন্ট্র্যাক্ট দেয়া। এ ছাড়া স্থানীয় লোকদেরকে চাষাবাদের জন্য ভূমি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়া।

সরকারের এই সমস্ত কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সরকারের পক্ষে স্থানীয় লোকদের সমর্থন অর্জন করা এবং স্থানীয় লোক গোরিলাদেরকে এলাকা হতে বহিস্কার করার ব্যাপারে সরকারের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে। শাসকদের এই সমস্ত কর্মসূচীর মোকাবিলা করার জন্য গোরিলাদেরকে স্বীয় প্রভাবশালী সমর্থকদেরকে আন্দোলিত করা বাঞ্চনীয় যাতে তারা জনগণের মাঝে সরকারী ষড়যন্ত্রকে পরিস্কার করে তুলতে পারে।

গোরিলাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকদের সম্বনয়ে শান্তি বাহিনী বা গোত্রীয় সেনাবাহিনী গঠন।

দ্বিতীয় কর্মসূচী যা সরকারের পক্ষ হতে অবলম্বন করা হয় তা হলো এই যে, সরকারী কর্মকর্তাগণ স্থানীয় আবাদীতে শান্তি কমিটি এবং গোত্রীয় সেনাবাহিনী গঠনের প্রচেষ্টা করে। এই কমিটি এবং স্থানীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে সরাসরি অথবা পেক্ষাপট হতে গোরিলা বিরোধ অভিযান চালানো হয়। অজ্ঞতা, গোত্রীয় বিদ্বেষ, লোভলালসা এবং আদর্শিক বিরোধীতাই এই সকল সেনাবাহিনী এবং কমিটি সমূহের উৎপত্তির কারণ হয়ে থাকে। লোক উন্নতির প্রলোভনে গোরিলাদের বিরোধীতা শুরু করে। কিছু সংখ্যক লোক গোরিলাদের চিন্তাধারা ও আদর্শের সাথে মতানৈক্য রাখে কিন্তু এই মতানৈক্য অনেক সময় প্রকাশ পায় না। যখন সরকারী কর্মকর্তাগণ গোরিলাদের বিরুদ্ধে লোকদেরকে উস্কানী দিতে থাকে তখন এই অপ্রত্যাশিত মতানৈক্য প্রকাশ পেতে শুরু করে। কিছু সংখ্যক লোক দেশপ্রেমিক বলে অভিহিত হয়ে থাকে তাদেরকে সরকার উস্কানী দেয় যে, গোরিলারা দেশের শত্রু তাই তারা দেশের স্বার্থে দেশদরদী হয়ে সরকারের পক্ষ নেয়। এটা গোরিলাদের দাওয়াত সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে হয়। কমিটি বা সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠার কারণ গোত্রীয় বিদ্বেষ হয়ে থাকে এতে এক পক্ষ সরকারের পক্ষে আর এক পক্ষ গোরিলাদের পক্ষে। কমিটিসমূহ এবং দেশীয় বাহিনীর অধিকাংশ অজ্ঞতার কারণে নিজ নিজ লোক নিজ নিজ গোত্র সাথে পরিচালিত হয়। তারা না আদর্শ সম্পর্কে ততো জ্ঞান রাখে আর না তারা দেশ প্রেমিকতার অর্থ বুঝে। এরা সবাই লোভ লালসা ও বন্ধুত্বের খাতিরে এ পথে চলতে শুরু করে থাকে। এই সমস্ত লোকদের মধ্যে আদর্শিক বিরোধীই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

শত্রু হিসাবে পরিগণিত হবে এর পর গোত্রীয় বিদ্বেষ পোষণ কারী এর পর তৃতীয় নম্বরে শত্রু হিসাবে স্থান পাবে দেশ প্রেমিক ব্যক্তিবর্গ। আদর্শিক বিরোধী ও গোত্রীয় বিদ্বেষ পোষণ কারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যেতে পারে। দেশপ্রেমিক লোকদেরকে স্বীয় দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের সমর্থন অর্জন করার চেষ্টা করা উচিৎ। যারা লোভ লালসার বশবতী হয়ে গোরিলা আন্দোলনের বিরোধী হয়ে থাকে তাদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আয়ত্তে আনা দরকার। যারা অজ্ঞতা বশত গোরিলাদের বিরোধী করে তাদেরকে যতোদূর সম্ভব দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের সমর্থন অর্জন করতে চেষ্টা করা যদি এতে সফলতা অর্জন করা সম্ভব না হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পথ অবশিষ্ট্য থাকবে।

❖ গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিষ্ঠা।

শাসকদের তৃতীয় বড়ো চাল গোরিলাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলের চতুরদিকে গুপ্তচরদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করা। এই ধরনের গুপ্তচর দু'ধরনের হয়ে থাকে। তন্মধে একদল স্থানীয় আবাদী হতে নেয়া হয় যারা গোরিলাদের কেন্দ্র বা মার্কাযের প্রতি লক্ষ্য রাখে। দ্বিতীয় প্রকারের গুপ্তচর যাদেরকে গোরিলা সংগঠনের মাঝে গোরিলা আকারে পাঠানো হয় তারা গোরিলাদের রূপ ধারণ করে গোরিলাদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাদের সাথে যুদ্ধেও অংশ নেয়। কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তাই হয়ে থাকে। বাহিরের গুপ্তচরদের ব্যাপারে গোরিলাদেরকে একটি পৃথক দল গঠন করার প্রয়োজন যারা সর্বদা এই সকল গুপ্তচরদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। ভিতরগত গুপ্তচরদের প্রতি লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব প্রত্যেক গোরিলা কমান্ডারদের ওপর ন্যস্ত হবে।

শাসকদের রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা

শাসকদের সর্বদা এই প্রচেষ্টাই হয় যে, গোরিলাদের নিরাপদ আশ্রয় স্থলে নিজেদের তৎপরতা বেশি বেশি বৃদ্ধি করা এ প্রসঙ্গে সরকারী কর্মকর্তাগণ স্বীয় আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং এর সাথে সাথে তারা সড়ক পথে বেশি বেশি করে পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ি ও সৈনিক চৌকি স্থাপন করে।

❖ গোরিলাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান

সেনাবাহিনী গোরিলাদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ সমাধান হিসাবে অভিযানও করতে পারে। গোরিলা যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযান মূলতঃ গোরিলাদেরকে জনগণ হতে পৃথক করার জন্য করা হয়। এ পরিস্থিতির পেক্ষাপটে গোরিলারা পাহাড়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং জনসাধারণ নিজেদের এলাকা ছেড়ে হিযরত করে। এর পর স্থানীয় লোকদেরকে গোত্রীয় শান্তিবাহিনী হিসাবে আনা হয় যারা পরে গোরিলাদের চিহ্নিত করতে থাকে।

❖ নিরাপদ আশ্রয় স্থলের সশস্ত্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা

নিরাপদ আশ্রয় স্থলের সশস্ত্র কাঠামো সেই সকল আসকারী প্রস্তুতির অনর্তগত হয়ে থাকে যা সমাজি এবং রাজনৈতিক কাঠামোর ব্যর্থতার পর শুরু হয়। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনী সামরিক অভিযান শুরু করে পারে। কিন্তু এর প্রস্তুতি অনেক পূর্ব হতে করতে হয়। এটা দু'পর্যায়ে হয়ে থাকে।

(১) সরকারী সামরিক অভিযানের পূর্বে সশস্ত্র প্রস্তুতি।

(২) সরকারী সামরিক অভিযান চলাকালে সশস্ত্র প্রস্তুতি।

সরকারী সামরিক অভিযানের পূর্বে সশস্ত্র প্রস্তুতি

গোরিলাদের উচিৎ যে, সরকারী সামরিক অভিযানের পূর্বেই নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতি পুরোপুরি করে রাখা। আত্মরক্ষার আয়োজনের ক্ষেত্রে হাতিয়ার এবং খাদ্য সামগ্রীর ভান্ডার পরিপূর্ণ করা। প্রত্যেক সংগঠন হতে লোক নিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ এবং জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া।

সামরিক অভিযানের পূর্বে নিম্নোক্ত প্রস্তুতি নেয়া অত্যাবশ্যক।

(১) আত্মরক্ষামূলক পরিকল্পণার নির্ণয়ন এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি।

(২) বিমান হামলা এবং গোলা বর্ষণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা।

(৩) হাতিয়ার ও খাদ্যদ্রব্যের ভান্ডার প্রস্তুত করা।

(৪) পিছটান দেয়ার পরিকল্পণা।

(২) সরকারী সামরিক অভিযান চলাকালে গোরিলাদের সশস্ত্র প্রস্তুতি

নিরাপদ আশ্রয় স্থলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য সশস্ত্র পদক্ষেপ নেয়ার পরিকল্পণা নেয়ার সময় দু'ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে পারে। প্রথমতঃ সরকারী সেনাবাহিনীর কিছু অংশ প্রথমেই নিরাপদ আশ্রয় স্থলের ভিতর উপস্থিত থাকবে। এবং দ্বিতীয়তঃ সরকারী সেনাবাহিনী আশ্রয় স্থলের বাহির থেকে আক্রমণ করে বসে।

❖ **নিরাপদ আশ্রয় স্থলের ভিতরে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে সামরিক অভিযান**

নিরাপদ আশ্রয় স্থলে সামরিক অভিযানের প্রক্কালে সম্ভবতঃ এটা হতে পারে যে সরকারী বাহিনী প্রথম থেকেই এই অঞ্চলে উপস্থিত থাকতে পারে। তারা পূর্ব থেকে নিজেদের জন্য অনেক সেনাচৌকি ও ফাঁড়ি প্রস্তুত করে রেখেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি সেনাবাহিনী সীমিত আকারে সামরিক অভিযান শুরু করে তাহলে এই অবস্থায় গোরিলাদেরকে স্বীয় স্থান পরিবর্তন করতে হবে। কেনোনা সেনাবাহিনী সামরিক তৎপরতার ঝুকি উপস্থিত রয়েছে। এই সময় সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই নিরাপদ আশ্রয় স্থলের বাহির থেকে রসদ পৌছায়। বিধায় যদি গোরিলারা তাদের বাহিরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং সেনাবাহিনীকে অবরোধ করার চেষ্টা করে তাহলে এ সব গুরুত্বপূর্ণ কর্মপন্থাই হবে। যখন সেনাবাহিনী অবরোধ জনিত বিপদের সম্মুখিন হয় তখন তাদেরকে বাহির থেকে সাহায্য করার জন্য আরো সেনাবাহিনী পাঠানো হয় এবং বিমান হামলাও চালানো হয়।

❖ **নিরাপদ আশ্রয় স্থলে বাহির থেকে সেনাবাহিনীর আক্রমণ**

নিরাপদ আশ্রয় স্থলে দ্বিতীয় প্রকারের অভিযান সেই সময় শুরু হয় যখন সেনাবাহিনী বাহির থেকে নিরাপদ আশ্রয় স্থলে আক্রমণ করে। এটা তাদের একটি দীর্ঘাস্থায়ী পরিকল্পনার অংশ হয়। সাধারণতঃ এই হামলা গোরিলাদের বিরুদ্ধে করা হয় এবং তাদের এলাকা দখল করে তার ওপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে করা হয়। এই পরিকল্পণা বাস্তবায়ন করার জন্য অত্র এলাকা দখল করার পর সেখানে সরকারী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি বৈকল্পিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়।

❖ গোরিলাদের যুদ্ধাভিযান ঘাঁটি।

গোরিলাদের যুদ্ধাভিযান ঘাঁটি ঐ স্থানকে বলা হয় যে স্থানকে গোরিলারা নিজেদের সশস্ত্র অভিযানের প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করে। যুদ্ধাভিযান ঘাঁটি কয়েক রকমের হয়ে থাকে। সাধারণতঃ গোরিলাদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল এবং যুদ্ধাভিযান ঘাঁটি এক অপরের নিকটই হয় কিন্তু তা পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। কখনো কখনো একে অপরের সাথে সংপৃক্তও হয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের যুদ্ধাভিযান ঘাঁটি নিরাপদ আশ্রয় স্থল এবং অভিযান স্থলের মধ্যবর্তী কোনো নিরাপদ স্থানে স্থাপিত হয় যে জায়গায় গোরিলারা নিজেদের হাতিয়ার এবং খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণ করে রাখে এবং সংরক্ষিত সরঞ্জামকে যুদ্ধের ময়দানে পৌছায়। তৃতীয় ধরনের যুদ্ধাভিযান ঘাঁটি অভিযানের এলাকাতেই হয়ে থাকে যেখান থেকে অভিযানের অতিপ্রয়োজনী বস্তু অতিতাড়াতাড়ি সরবরাহ করা হয়। এ যুদ্ধাভিযান ঘাঁটি সাময়িকভাবে সংগঠিত হয় এবং সময়সাপেক্ষ ও প্রয়োজন বোধে পরিবর্তনও হতে থাকে। যদি মুজাহিদদের যুদ্ধাভিযান ঘাঁটি তাদের নিরাপদ আশ্রয় স্থলেই স্থাপিত হয় অথবা এর নিকটবর্তী হয় এবং যুদ্ধাভিযান ঘাঁটিতে গোরিলাদের অবস্থা নিরাপদ আশ্রয় স্থলের ন্যায়ই হয়ে থাকে তাহলে তার প্রতিরক্ষা সেই পদ্ধতিতে করা হবে যে পদ্ধতিতে নিরাপদ আশ্রয় স্থলের হিফাযত করা হয়। অন্যথায় যখন যুদ্ধাভিযান ঘাঁটি শত্রুদের অঞ্চলে উপস্থিত হবে তখন তার হিফাযত ক্যামুফ্লাজের মাধ্যমে করা যেতে পারে। অবশ্য

গোরিলারা যুদ্ধাভিযানে নিজেদের হিফাযতের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয় এখানেও সেই পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

❖ গোরিলা যুদ্ধাভিযানের এলাকা

গোরিলাদের জন্য যুদ্ধাভিযানের এলাকা ঐ সকল অঞ্চল পরিগণিত হয় যা সরকারের প্রশাসনিক বিভাগের অধিনে হবে। এই সমস্ত এলাকা পল্লি এবং শহর অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে থাকে। গোরিলা যুদ্ধের জন্য এ অঞ্চল গুলোর মধ্য হতে প্রত্যেক অঞ্চলের গুরুত্ব রয়েছে। গোরিলারা নিজেদের অভিযানের এলাকায় প্রত্যেক এলাকার গুরুত্বকে এবং গোরিলা যুদ্ধে কোনো বিশেষ এলাকার অভিযান হতে অর্জিত উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে অভিযান পরিচালনা করে থাকে।

গোরিলা অভিযানের ময়দান বা ক্ষেত্র

গোরিলাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো এই যে, সরকারী শাসন ব্যবস্থাকে অচল করা। বিধায় গোরিলাদের আসকারী অভিযানের কেন্দ্রবৃন্দু সরকার প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাকে অচলাবস্থায় পরিগণিত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দু'টি উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে গোরিলা অভিযান পরিচালিত করা হয়।

প্রথম উদ্দেশ্য হলো এই যে, সরকারী শাসন ব্যবস্থাকে বিভিন্ন ধরনের অধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত করা। এর উদাহরণ হাতি ও ইদুরের লড়াইয়ের মতো। যদি ইদুর হাতি সাথে যুদ্ধ করতে চায় তাহলে তার কাছে এতটুকু শক্তি নেই যে, একটি হামলায় হাতিকে বশ করে ফেলবে। হাতির শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত-বিক্ষত করা ছাড়া ইদুরের কেনো উপায় নেই। ইদুরের এ অভিযানে হাতির শরীর হতে যে রক্ত প্রবাহিত হবে তাতে হাতি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তার মধ্যে লড়াইয়ের ক্ষমতা কমে যাবে। কিন্তু হাতি তো ইদুরের মোকাবিলায় হাতিই বটে বিধায় ক্ষত-বিক্ষত করলে হয়তো হাতি দুর্বল হবে কিন্তু ভূপাতিত হবে না। এই ধরনের অভিযান গোরিলা যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে চালানো হয়ে থাকে।

হাতিকে ভূপাতিত করার জন্য তার শুঁড়ে অথবা জোড়ায় আঘাত হানা অথবা ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন পড়ে। এ দ্বারা হাতির মধ্যে লড়াই করার ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়

এবং সে ভূপাতিত হয়ে পড়ে। এই কৌশলই গোরিলাদেরকে দ্বিতীয় ধাপে শাসন ব্যবস্থার এই ক্ষমতাকে নস্যাৎ করার জন্য প্রস্তুত করে যার দ্বারা সরকার জনগণকে অধিনস্থ করে রেখেছে এবং গোরিলাদের মোকাবিলা করছে। যদি এ কাজে গোরিলারা সফলতা অর্জন করে তাহলে এ ভাবে শাসন ব্যবস্থা অকেজো হওয়া সম্ভব। এই ধরনের অভিযান গোরিলা যুদ্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে বেশি করা হয়। গোরিলা অভিযান শহর ও পল্লি উভয় অঞ্চলেই চালানো হয়। কতিপয় অভিযানের ধরণ এমনও হয় যার প্রভাব দেশের সর্ব পর্যায়ে পড়ে। গোরিলা যুদ্ধে এই তিন প্রকারের অভিযানের বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। যেমনঃ

- পল্লি অঞ্চলের অভিযান।
- নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করা।
- শাসকদের আধিপত্তের অবসান ঘটানো।
- শহর অঞ্চলের অভিযান।
- গোরিলাদের উপস্থিতির অনুভব করানো।
- অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন।
- শাসন ব্যবস্থা অকেজো করা।
- রাজনৈতিক আন্দোলনকে সক্রিয় করা।
- দেশব্যাপি অভিযান।
- সারা দেশে উপস্থিতি অনুভব করানো।
- শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনীতির অচলাবস্থার সৃষ্টি।
- রাজনৈতিক সক্রিয়তা।

গোরিলা যুদ্ধ এবং কার্যকর তৎপরতা

❖ পরিচিতি

- গোরিলাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে লড়াইয়ের সরঞ্জাম অর্থ-সম্পদের আদান প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের অভিযান ক্ষেত্রের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এবং সেখান থেকে নিরাপদে আশ্রয়স্থলে প্রত্যাবর্তন করার পর্যায়কে 'প্রত্যক্ষ কার্যকরী তৎপরতা' বা 'তানফিযে আমলিয়াত' নামে অভিহিত করা হয়। এ কার্যকরী তৎপরতার কয়েকটি স্তর রয়েছে।
- গোরিলা অভিযান তৎপরতাসমূহ।
- অভিযান তৎপরতাসমূহের পরিকল্পনা।
- ফন্দিফিকির বা কৌশল অবলম্বন।
- অভিযান তৎপরতাসমূহ সংগঠিত করা অথবা সাধারণ ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা।

❖ গোরিলাদের অভিযান তৎপরতাসমূহ।

গোরিলা অভিযানসমূহ কার্যকর তৎপরতার ঐ অংশকে বলা হয় যাতে গোরিলারা স্বীয় অভিযান স্থলের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। এই তৎপরতাসমূহ দাওয়াতী, প্রচার মাধ্যম, রাজনৈতিক এবং সশস্ত্র হতে পারে। সশস্ত্র অভিযান এবং অন্যান্য কর্মতৎপরতার মাঝে পার্থক্য হলো এই যে, সশস্ত্র অভিযানের লক্ষ্যবস্তু হয় শত্রুপক্ষ প্রক্ষান্তরে অন্যান্য কর্মতৎপরতা তথা অবশিষ্ট শাখাগুলোর লক্ষ্যবস্তু হয় জনগণ। এই জন্য উভয়ের প্রকারভেদ এক অপর হতে ভিন্ন।

❖ দাওয়াতী, প্রচার মাধ্যম এবং রাজনৈতিক তৎপরতার প্রকারভেদ

দাওয়াতী, প্রচার মাধ্যম এবং রাজনৈতিক তৎপরতার উদ্দেশ্য গোরিলাদের বিরোধীদের সংখ্যা কম করা এবং সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো এই যে, জনগণকে আন্দোলিত করা এবং তাদেরকে গণঅভ্যুত্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য নিম্নোক্ত তৎপরতাসমূহকে কার্যকরী করা হয়।

- ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ।
- স্থানীয় বৈঠক বা এজতিমা।
- জনসভা।
- জুম্মাহর খুৎবাহ।
- ইলেক্ট্রোনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহার।

❖ **সশস্ত্র অভিযান**

গোরিলা সশস্ত্র অভিযান সাধারণতঃ দুই ধরনের হয়ে থাকে। (১) ব্যক্তিগত গোরিলা অভিযান (২) সমষ্টিগত অভিযান।

❖ **(১) ব্যক্তিগত গোরিলা অভিযান**

ব্যক্তিগত গোরিলা অভিযানসমূহ ঐ সমস্ত অভিযানকে বলা হয় যাকে এক বা একের অধিক গোরিলারা কোনো বড়ো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখা ছাড়াই সম্পাদন করে। এই অভিযানকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

- মাইন অভিযান।
- টার্গেট ক্লিনিগ।
- কামিন বা ওতপেতে হামলা করা।
- তা'অরুজ বা সামনাসামনি মোকাবিলা করা।
- স্নাইপার (sniper) বন্দুকের ব্যবহার।

❖ **গোরিলা সমষ্টিগত অভিযান**

❖ গোরিলা যুদ্ধে সমষ্টিগত অভিযান ঐ অভিযানকে বলা হয় যাতে কোনো ছোট্ট অথবা বড়ো উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য একাদিক ব্যক্তিগত অভিযান চালানো হয়।

সমষ্টিগত অভিযান নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত হতে পারে।

- এ গুলোকে গোরিলাদের সবচাইতে বড়ো অভিযান নামে অভিহিত করা হয়। এই অভিযানগুলোর উদ্দেশ্য শত্রুদেরকে স্বীয় এলাকা হতে বহিস্কার করা অথবা বিশৃঙ্খলা নিবারণ করে নিজেদের দাওয়াতী কাঠামোকে প্রতিষ্ঠা করা ।

- গোরিলা যুদ্ধের দ্বিতীয় বড়ো সমষ্টিগত অভিযান উহাকে বলা হয় যাতে কোনো এলাকা হতে শত্রুদেরকে দখলচ্যুত করা অথবা ঐ অঞ্চলের শত্রুদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা। গোরিলা অভিযান কোনো বড়ো উদ্দেশ্য ও লক্ষের অংশকে সম্পূর্ণ করাকে বলা হয়। এ অভিযান কোনো পরিপূর্ণ অভিযান নয় বরং এটা একটি অসমাপ্ত অভিযান হয়ে থাকে যার মাধ্যমে গোরিলাদের নিকট রসদ পৌছানো উদ্দেশ্য হয়।
- গোরিলা মিশন যা একটি ছোট্ট উদ্দেশ্যকে হাসিল করার জন্য অভিযান চালানো হয়। যেমন কোনো এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী শত্রুকে তার পথ হতে টার্গেট ক্লিনিগের মাধ্যমে ধমন করা।

❖ অভিযান পরিকল্পণা

গোরিলা অভিযান এবং ব্যবস্থাপনার পর্যায়কে পরস্পর একে অপরের সাথে সংপৃক্ত করে উভয়কে সংঘবদ্ধভাবে সম্পাদন করাকে পরিকল্পণা বলা হয়।

❖ পরিকল্পণার নিয়মনীতি

যে কোনো অভিযান পরিচালনা করার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহন করা হয় সেই সম্পর্কে নিম্নোক্ত কর্মসূচীকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

- সশস্ত্র জ্ঞান।
- সশস্ত্র অভিযানের পূর্বে পর্যালোচনা।
- মৌলিক বৃত্তের নির্ধারণ।
- অভিযান সফলতার সম্ভবনা।
- বিপদ আপদের সম্ভবনা।
- লক্ষবস্তুর নির্ধারণ।
- যুদ্ধ পদ্ধতির নির্ধারণ।
- সশস্ত্র নিয়মনীতি পর্যালোচনা।
- মিডিয়া অভিযান বা প্রচার কার্য পরিচালনা।

- পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ উপাদান।
- অভিযান তৎপরতার প্রস্তুতি।
- নেতৃত্ববৃন্দের ভূমিকা।
- সরঞ্জাম বা অর্থ-সম্পদ প্রদানের ব্যবস্থা এবং রসদ পৌছানোর ব্যবস্থা।
- তারাস্‌সুদ বা (অভিযানের পূর্বে) পর্যবেক্ষণ এবং (অভিযান চলা কালিন) পর্যবেক্ষণ করা।
- স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা।
- যোগাযোগের ব্যবস্থা করা।
- আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা।
- উক্ত অভিযানের সাথে অন্যান্য অভিযানের তুলনামূলক পর্যালোচনা।
- যুদ্ধ ক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হওয়া।
- যুদ্ধের ময়দানে প্রভাব বিস্তার করা।
- নমনীয়তা।
- স্থান ও কাল হতে লাভবান।
- যুদ্ধে নিজেদের জন্য ভারসাম্য বজায় রাখা।
- (প্রতি পক্ষের আঘাত) সহ্য করার দক্ষতা।
- অভিযান তৎপরতার সমাপ্তী।
- প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুতি।
- শত্রুদের সম্ভাব্য হামলার প্রতিকার ব্যবস্থা।
- আহতদের সেবা।
- স্থানীয় লোকদের সাথে যোগাযোগ।